

একটি দেশি মুরগি এবং পাঁচ দিনের রিমান্ড



জাবেদ ভুঁইয়া



খিচুড়ি প্রকাশন

একটি দেশি মুরগি এবং পাঁচ দিনের রিমান্ড

খিচুড়ি সাহিত্য সংকলন

একটি দেশি মুরগি এবং পাঁচ দিনের রিমান্ড

ও অন্যান্য নির্বাচিত গল্প

জাবেদ ভূঁইয়া

খিচুড়ি প্রকাশন

ঢাকা | khichuri.net

গ্রন্থ পরিচয়

বইয়ের নাম: একটি দেশি মুরগি এবং পাঁচ দিনের রিমান্ড

লেখক: জাবেদ ভূঁইয়া

প্রকাশনা: খিচুড়ি প্রকাশন (khichuri.net)

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২৬ (প্রথম ডিজিটাল সংস্করণ)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ: খিচুড়ি আর্ট স্টুডিও

হরফ বিন্যাস: কালপুরুষ ও সোলাইমানলিপি ওটিএফ

এই গ্রন্থের সমুদয় গল্প ইতিপূর্বে 'খিচুড়ি' সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের বাণিজ্যিক পুনরুৎপাদন বা পরিবর্তন আইনত দণ্ডনীয়। ব্যক্তিগত পঠন ও সাহিত্যচর্চার জন্য উন্মুক্ত।

উৎসর্গ

যাঁরা গল্প ভালোবাসেন,
এবং জীবনের চড়াই-উতরাইয়ের মাঝেও
ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির রেখা ধরে রাখেন...

সূচিপত্র

ভূমিকা: জাবেদ ভূঁইয়া-এর গল্পের ভুবন

1. একটি দেশি মুরগি এবং পাঁচ দিনের রিমান্ড

2. ছক্কুদা ও জগা খিচুড়ি প্রজেক্ট

3. বল্টু ভাইয়ের হাঁচি

4. বল্টু ভাইয়ের ব্যায়াম

5. টুনুচাচার টুনটুনি রহস্য

6. তিনটি দৃশ্য ও একটি আংশিক প্রেমের গল্প

7. বাংলোর রহস্য

8. হাটবার

9. গল্পগুলো হারিয়ে যায়

10. কেউ আলোয় আসে

11. কাকের শিল্পবোধ

12. ইস্টপেন্ট্রা

13. ফেরার পথের ফকির

14. খোকন রোকন দুই ভাই

.....

15. এক কাপ চা এবং তিরিশখানা ভোট

.....

লেখক পরিচিতি

.....

ভূমিকা: জাবেদ ভূঁইয়া-এর গল্পের ভুবন

গল্প তো কত রকমেরই হয়: কিছু গল্প চোখের সামনে বাস্তবতাকে এনে দাঁড় করায়, কিছু গল্প হৃদয়ের কোনো নিভৃত কোণে ফেলে আসা স্মৃতির গন্ধ ফিরিয়ে দেয়, আবার কিছু গল্প আমাদের দৈনন্দিন যান্ত্রিক জীবনের বিষাদকে এক লহমায় মুছে দিয়ে ঠোঁটের কোণে অনাবিল হাসি ফুটিয়ে তোলে। লেখক জাবেদ ভূঁইয়া-এর গল্পের বৈশিষ্ট্য ঠিক এখানেই। তাঁর কলম কখনো কড়া সামাজিক বাস্তবতার ভেতর থেকে তুলে আনে সূক্ষ্ম কৌতুকরস, কখনো বা গ্রামীণ ধুলোমাখা মেঠোপথ আর হাটবারের চিরচেনা মানুষের হৃদস্পন্দনকে শব্দে বন্দি করে।

এই সংকলনের প্রতিটি গল্পে রয়েছে জীবনের এক একটি ভিন্ন স্বাদ। ‘একটি দেশি মুরগি এবং পাঁচ দিনের রিমান্ড’ কিংবা ‘এক কাপ চা এবং তিরিশখানা ভোট’ গল্পগুলোতে যেমন রয়েছে সমসাময়িক ব্যবস্থার ওপর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, তেমনই ‘ছক্কুদা ও জগা খিচুড়ি প্রজেক্ট’ কিংবা ‘বল্টু ভাই’-এর গল্পগুলোতে রয়েছে নিখাদ নির্ভেজাল রম্যরস। আবার ‘ইস্টপেন্‌ট্রা’ ও ‘কাকের শিল্পবোধ’-এ যেমন রয়েছে ভিন্নধর্মী রূপক ও কল্পনার ছোঁয়া, তেমনই ‘বাংলোর রহস্য’ বা ‘কেউ আলোয় আসে’-তে পাঠক খুঁজে পাবেন রহস্য ও মনস্তাত্ত্বিক টানটান রোমাঞ্চ। অন্যদিকে ‘খোকন রোকন দুই ভাই’ কিংবা ‘ফেরার পথের ফকির’-এ ছড়িয়ে আছে স্মৃতিকাতরতা ও গভীর মানবিক অনুভূতি।

‘খিচুড়ি’ পোর্টালে ছড়িয়ে থাকা জাবেদ ভূঁইয়া-এর এই নির্বাচিত পনেরোটি জনপ্রিয় গল্পকে এক মলাটে ডিজিটাল ইবুক আকারে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশাকরি, কিণ্ডেল, ফোন বা ট্যাবলেটে বসে যে প্রান্তেই এই বই খোলা হোক না কেন, প্রতিটি গল্প পাঠকের মনে এক টুকরো আনন্দ ও স্বস্তির খোরাক জোগাবে।

সম্পাদক, খিচুড়ি প্রকাশন

একটি দেশি মুরগি এবং পাঁচ দিনের রিমান্ড



ভোরবেলা কুয়াশা ভেদ করে সূর্য ওঠার আগেই কবির মিয়ার ঘুম ভেঙেছিল। ঘুম ভাঙার পর মনটা বেশ ফুরফুরে থাকার কথা ছিল, কারণ উঠোনের কোণে কাঠের খোয়াড়ে রাখা পাঁচখানা দেশি মুরগি গত সপ্তাহ থেকেই ডিম দিতে শুরু করেছে। দিনকাল বড় আকালের। বাজারে চালের কেজি আশি টাকা, তেলের বোতলে হাত দিলে ছাঁকা লাগে। এই দুর্দিনে সকালে খোয়াড় থেকে উষ্ম দুটো ডিম কুড়িয়ে নেওয়া কবির মিয়ার জীবনে এক পরম সাঙ্কনার মতো ছিল।

কিন্তু খোপের ডালা খুলতেই কবির মিয়ার বুকটা ছাঁত করে উঠল। খোয়াড় একদম ফাঁকা। একটা ভাঙা মাটির খুরি উল্টে পড়ে আছে, আর নিচে ছড়িয়ে আছে কয়েকটা তাজা লালচে পালক।

চুরি! মাত্র ডিম দেওয়া শুরু করা পাঁচটি তাগড়া দেশি মুরগি এক রাতেই উধাও!

কবির মিয়া মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তবে চোর খুঁজতে তাকে বেশি বেগ পেতে হলো না। গ্রামের পাতি চোররা মুরগি চুরি করলে রাতারাতি ভ্যান ডেকে দূরের হাটে চালান করে দেয়, কিন্তু এই চুরির ধরন অন্যরকম। একটু খোঁজখবর নিতেই পাড়ার ছোকরারা ফিসফিস করে আসল খবর ফাঁস করে দিল।

ঘটনা ঘটেছে গত মধ্যরাতে। ইউনিয়নের সরকারি দলের বড় নেতা মোতালেব মাতব্বরের বৈঠকখানায় মদের আসর বসেছিল। দূরদূরান্ত থেকে চার-পাঁচজন ক্ষমতাধর চেলাচামুণ্ডা এসেছিলেন নেতার মেহমান হয়ে। বাংলা আর বিলিতি মদের টান যখন ভুঙ্গে, তখন হঠাৎ নেতার শখ চাপল, দেশি মুরগির তাজা বারবিকিউ খেতে হবে। কিন্তু রাত তখন পৌনে দুটো। এই গভীর রাতে এতগুলো জ্যান্ত দেশি মুরগি কোথায় পাওয়া যাবে?

মুশকিল আসান করল এক একনিষ্ঠ কর্মী। সে মাতব্বরকে বলল, “নেতা, চিন্তা কইরেন না। কবির মিয়ার খোয়াড়ে পাঁচটা হুষ্টপুষ্ট দেশি মুরগি আছে, দিনরাত খালি কক-কক করে।”

ব্যাস, সমাধান হয়ে গেল। রাজার দেশে তো প্রজার সম্পদে রাজার জন্মগত হক থাকেই। জমিজমা, খালবিল যেখানে নেতার নামে চলে, সেখানে পাঁচটা মুরগি তো কোন ছাড়! কর্মীরা গিয়ে নিঃশব্দে রাতের আঁধারে খোয়াড় সাফ করে নিয়ে এসেছিল।

সকাল আটটার দিকে বুক ফুলিয়ে মোতালেব মাতব্বরের বাড়ির দিকে রওনা হলো কবির মিয়া। ভেবেছিল একটা বিহিত হবে। কিন্তু নেতার বাড়ির উঠোনে পা দিতেই কবির মিয়ার চোখ স্থির হয়ে গেল। উঠোনের এককোণে ছাইয়ের পাশে তখনও তার মুরগির পালকগুলো ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। তার খাঁটি দেশি লাল মোরগের লেজের সেই তেকোনা লম্বা পালকটা তো দেখলেই চেনা যায়। এমনকি নেতার বাড়ির ঝাড়ুদার ছাইয়ের ভেতর থেকে হাড়গোড় কুড়াতে কুড়াতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “কালকে রাতের বারবিকিউর স্বাদ নাকি খাসা হইছিল কবির ভাই!”

সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনো অভাব রইল না। রাগে কবির মিয়ার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। সে সোজা ছুটল থানায়।

থানার ডিউটি অফিসারের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কবির মিয়া যখন কাঁপাকাঁপা গলায় মোতালেব মাতব্বরের নামে মুরগি চুরির অভিযোগ করল, তখন সেখানে উপস্থিত চার-পাঁচজন কনস্টেবল আর উপ-পরিদর্শক সাহেব প্রথমে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ গমগম করে পুরো থানা কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলেন। যেন তাদের গোটা চাকরিজীবনে এমন কৌতুক আর শোণেননি।

টেবিলে রাখা ফাইলের ওপর এক চাপড় মেরে দারোগা বললেন, “কবির মিয়া, বয়স তো কম হইলো না। বুদ্ধি কি মাথায় একটুও নাই? তোমার মুরগি চুরি গেছে, তুমি ভালোয়

ভালোয় বাড়ি যাও। মুরগি গেছে, কয়দিন পর আবার কিনতে পারবা। কিন্তু বাড়িবাড়ি কইরা জীবনটা যদি যায়, জীবন ক্যাডা ফিরায়া দিব কও?”

কবির মিয়া মাথা নিচু করে থানা থেকে বের হয়ে এলো। বুকের ভেতর এক দলা অপমান আর বিরস মন নিয়ে সে বাজারের পথ ধরল।

বাজারে গিয়ে সে দেখল, মোড়ের চায়ের দোকানে রাখা টেলিভিশনটার সামনে উপচে পড়া মানুষের ভিড়। টেলিভিশনের রঙিন পর্দায় তখন প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ চলছে। কী শান্ত, কী স্নেহময় গম্ভীর কণ্ঠস্বর! জনগণের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে গিয়ে তিনি কেমন মায়ামাখা চোখে তাকাচ্ছেন, দেশের গরিব মানুষের এক ইঞ্চি জমিও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় জানাচ্ছেন।

চা-দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কবির মিয়া হাঁ করে সেই ভাষণ শুনল। শুনে তার চোখের কোণায় প্রায় পানি এসে যাওয়ার দশা হলো। কবির মিয়া মনে মনে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, “আহা! মানুষটা কী ভালো! জনগণের জন্য কী অসম্ভব দরদ তার অন্তরে! কিন্তু কপাল খারাপ, এমন খাঁটি আর দরদী নেত্রীর নিচে জুটেছে যত সব ডাকাত, চোর আর বদমাশ নেতাকর্মী। এই ফেরেশতা মার্কী মানুষটা যদি জানত তার নিচের চামচারা সাধারণ মানুষের মুরগি পর্যন্ত চুরি করে খায়, তবে নিশ্চয়ই এদের আন্ত রাখত না!”

মনটা কিছুটা হালকা করে কবির মিয়া বাড়ি ফিরছিল। হাতে তখন আধাসের লবণ আর এক পোয়া ডালের একটা পাতলা পলিথিনের ব্যাগ। কিন্তু গ্রামের নির্জন মেঠোপথ ধরে ঢালুতে নামতেই হঠাৎ কোথেকে চার-পাঁচজন ষণ্ডা মার্কী জোয়ান ছেলে এসে তার পথ আগলে দাঁড়াল। তাদের চোখেমুখে তাজা মাদকের লালচে আভা।

সামনে এসে একজন কবির মিয়ার শার্টের কলারটা এক টানে মুচড়ে ধরল।

“কিরে শালার পুত, থানায় গিম্মি নাকি?”

কবির মিয়া কিছু বলার আগেই সপাং করে একটা চড় এসে পড়ল তার গালে। তারপর শুরু হলো কিল, লাথি আর বাঁশের চ্যালা দিয়ে বেধড়ক পেটানি। কবির মিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল, কিন্তু সেই শুনশান মেঠোপথে বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না। মারতে মারতে যখন কবির মিয়ার মুখ দিয়ে রক্ত আর লালা একসাথে বের হতে লাগল, তখন একজন তার বুকের ওপর বুট জুতো চেপে ধরে বলল, “নেতার নামে এই গ্রামে গুজব ছড়ালে তোর লাশটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, মনে রাখিস। এবারকার মতো মাপ পাইলি।”

ওরা চলে যাওয়ার পর কবির মিয়া বুঝতে পারল তার বাজারের ব্যাগটা কোথায় ছিটকে গেছে তার কোনো হদিস নেই। মাথাটা অসাড় হয়ে আছে। কপাল বেয়ে টপটপ করে গরম রক্ত ঝরছে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল, কপালের একপাশটা ফেটে আলুর মতো ফুলে গেছে।

যন্ত্রণা আর অপমানে কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে বাজারের একটি ফার্মেসিতে গিয়ে তিনটে সেলাই আর সাদা ব্যান্ডেজ জড়াল সে। কিন্তু মাথা ফাটানোর এই আঘাত কবির মিয়ার ভেতরের সহজ-সরল মানুষটাকে যেন একরোখা এক জেদি মানুষে পরিণত করল। সে আবারও থানায় হাজির হলো।

এবার ডিউটি অফিসারের রুমের টেবিলের ওপর হাত রেখে কবির মিয়া চিৎকার করে বলল, “স্যার! আপনারা বললেন মুরগির মায়া ছাড়তে। মুরগির মায়া ছেড়ে বাড়ি ফিরছিলাম, কিন্তু দেখেন ওরা আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে! এবার তো আপনারা কিছু একটা করবেন?”

এবার অবশ্য কেউ হাসল না।

ভেতরে বসা বড় কর্মকর্তা মুখে একদলা জর্দা দেওয়া পান পুরে দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কবির মিয়ার ব্যান্ডেজ করা রক্তাক্ত মাথার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে পান চিবিয়ে, পিক ফেলার ডাস্টবিনে লাল পিক ফেলে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “কবির মিয়া, এই কেস নেওয়ার ক্ষমতা এই থানার কোনো অফিসারের নাই।”

কবির মিয়া হতভম্ব হয়ে গেল। “কেন স্যার?”

কর্মকর্তা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, “তুমি মিয়া নেতার সাথে পাঙ্গা নিতে পারবা না। বড়লোকের সাথে গরিবের লড়াই হয় না। তুমি বরং এক কাজ করো, নেতার পায়ে গিয়ে ধরো, একটা আপস করো। উনি দুনিয়ার কালো টাকার মালিক, হাজার কোটি টাকা ওনার ডান হাতের ময়লা। হয়তো মেজাজ ভালো থাকলে তোমার ওপর দয়া করে মুরগির দাম আর চিকিৎসার টাকাটা ছুড়ে দিয়েও দিতে পারেন। বুঝলো?”

কবির মিয়া আবারও থানা থেকে বের হয়ে এলো। তার মাথা ঘুরছিল। দুপুরের প্রখর রোদে রক্তাক্ত শরীরটা যেন আর টানতে পারছে না। তবে এই চরম বিপদের মাঝেও তার অবচেতন মনে আবারও সেই টিভির কথা মনে পড়ল। প্রধানমন্ত্রী যদি এই অবিচারের কথা এক নজর জানতেন, তবে এই দারোগা আর এই নেতার কি কোনো নিস্তার থাকত? নিশ্চয়ই সঠিক বিচার হতো!

কবির মিয়ার সংসারে নিজের বলতে আর কেউ ছিল না। অনেক বছর আগে এই একটিমাত্র মেয়ের জন্ম দিতে গিয়েই তার বউ পেটের ব্যথায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। সেই

থেকে মেয়েটাই কবির মিয়ার পৃথিবী। নাম ময়না, বয়স সবে সতেরোয় পড়েছে। অভাবের সংসারে বাবার সাথে হাসিমুখে দিন কাটায়।

কিন্তু বাড়ি ফিরে উঠোনে পা দিতেই কবির মিয়ার বুকটা হিম হয়ে গেল।

ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে ভাত রাঁধার অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা উল্টে পড়ে আছে উঠোনে। ময়না ঘরে নেই।

প্রতিবেশীদের এক বুড়ি ফিসফিস করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, “কবির, তুমি থানায় যাওয়ার পরেই মাতব্বরের চার-পাঁচটা ছেলে মোটরসাইকেল নিয়া আইসা ময়নারে জোর কইরা তুইলা নিয়া গেছে।”

মাথার ব্যান্ডেজ ছিঁড়ে ফেলার মতো এক উন্মাদ আক্রোশে কবির মিয়া উন্মত্তের মতো ছুটল নেতার বাড়ির দিকে।

নেতার সদর দরজায় পৌঁছাতেই কবির মিয়ার পা দুটো যেন মাটির সাথে পেরেক দিয়ে আটকে গেল।

খোলা বারান্দার এক কোণে গুটিসুটি মেরে মেঝেতে বসে কাঁদছে ময়না। তার গায়ের জামাটা শতচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলে আছে, ওড়নাটা কোথায় নেই, আর শরীরের উন্মুক্ত জায়গায় কালসিটে দাগ।

কবির মিয়ার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। রাগে, ঘৃণায় আর চরম অপমানে সে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল। পৃথিবীর সব আলো যেন নিভে গেছে।

বারান্দার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা এক চ্যালা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কবির মিয়ার মুখের ওপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “জীবন বাঁচাইতে চাইলে মেয়েটারে নিয়া এই গ্রাম ছেড়ে আজকেই পালাও। নেতার খুব রাগ হইছিল তোমার ওপর। তবে নেতার মনটা বড় দয়ালু, মায়ার শরীর, তাই তোমার বেশি কিছু করে নাই। জাস্ট একটা শিক্ষা দিল।”

কবির মিয়া অশ্রুসজল চোখে টলতে টলতে মেয়ের কাছে গেল। মেয়েটা মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল। কবির মিয়া তখন কাঁপতে কাঁপতে নেতার ঘরের খোলা দরজার ভেতর একবার চোখ ফেলল।

ঘরের ভেতর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা হাওয়ায় খালি গায়ে লুঙ্গি পরে গা এলিয়ে বসে আছেন মোতালেব মাতব্বর। আর তার ঠিক মাথার ওপর দেয়ালে সোনা দিয়ে বাঁধানো বিশালাকার একটি ফ্রেম। সেই ফ্রেমে প্রধানমন্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে পরম স্নেহে দাঁড়িয়ে আছেন মাতব্বর, আর দুজনের মুখেই আলো ছড়ানো উজ্জ্বল হাসি।

কবির মিয়ার বকের ভেতর জমে থাকা দীর্ঘদিনের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর অন্ধ ভক্তির শেষ কাঁচের টুকরোটিও সেই মুহূর্তে চুরমার হয়ে ভেঙে গেল।

মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে কবির মিয়া শেষবারের মতো আবারও থানায় নিয়ে গেল। তার বিশ্বাস ছিল, মুরগির বিচার না হোক, মারধরের বিচার না হোক, একটা মেয়ের ইজ্জত হরণের বিচার তো এই দেশে হবেই।

কিন্তু থানার ওসি পুরো ঘটনা শুনে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ তুলে তাকালেন না।

টেবিলের ওপর রাখা সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ওসি অত্যন্ত নির্লিপ্ত ও স্বাভাবিক গলায় বললেন, “কবির মিয়া, এটা আঠারো কোটি মানুষের একটা বিশাল দেশ। এত বড় একটা দেশে এইরকম দুই একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ধর্ষণ তো হইতেই পারে। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নাই। চেপে যাও।”

কবির মিয়ার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ওসির দিকে।

ওসি বললেন, “আমি তোমার ভালোর জন্যই বলি, তুমি নেতার কথা শোনো। এই এলাকা ছেড়ে সোজা ঢাকা কিংবা অন্য কোথাও পালিয়ে যাও। কারণ এই নেতা খোদ প্রধানমন্ত্রীর খাস লোক, বন্ধুস্থানীয় মানুষ। তার মাথার একটা চুল ছোঁয়ার মতো ক্ষমতাও এই দেশের কোনো পুলিশের নাই।”

কবির মিয়ার যা বোঝার, তা এক লহমায় খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা হয়ে গিয়েছিল।

সে আর কোনো কথা বলল না। কোনো কাকুতি-মিনতি করল না। মেয়ের হাত ধরে নিঃশব্দে থানা থেকে নেমে এলো।

ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি, মুরগির ভাঙা খোয়াড়, সব ফেলে রেখে সন্ধ্যার মুখে মেয়েকে সাথে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল কবির মিয়া।

পথটা ছিল অত্যন্ত নির্জন। গ্রামের শেষ সীমানায় বিশাল এক ফাঁকা মাঠ, আর মাঠের ঠিক মাঝখানে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা শতবর্ষী এক সুবিশাল বটগাছ। চারপাশে মাইলের পর মাইল আর কোনো মানুষ নেই, কোনো বসতি নেই, কোনো পুলিশ নেই, কোনো নেতা নেই। আছে শুধু মুক্ত হাওয়া আর গোঁধূলের রক্তিম আকাশ।

সেই বটগাছের নিচে এসে কবির মিয়া হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

মেয়ের হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে শূন্য আকাশের দিকে তাকাল। যে শরীরে সারাদিনের মারের দাগে রক্ত জমে আছে, যে বকে আজ তার জীবনের সবটুকু মর্যাদা লুট হয়ে গেছে,

সেই বুক ভরে সে শেষবারের মতো মুক্ত বাতাস টেনে নিল।

তারপর নিজের সর্বশক্তি দিয়ে, জীবনের সমস্ত ঘৃণা আর ধিক্কার একত্র করে সে খোলা বাতাসে বুনো পশুর মতো চিৎকার করে উঠল:

“আমাদের নেতাগুলো সব শুয়োরের বাচ্চা! আর এমন জানোয়ারগুলোকে যে মাথায় তুলে রাখে, সেই প্রধানমন্ত্রীও একটা মস্ত বড় শুয়োরের বাচ্চা!”

খোলা মাঠের বাতাসে সেই চিৎকারের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল। চারপাশ আবার আগের মতোই নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

পরদিন দেশের প্রথম সারির সমস্ত জাতীয় দৈনিকের শেষ পাতায় এক কলামের একটি ছোট্ট সংবাদ ছাপা হলো:

‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরচিপূর্ণ কটুক্তি ও গুজব ছড়ানোর দায়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনে কবির মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। বিজ্ঞ আদালত তার পাঁচ দিনের পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।’

ছক্কুদা ও জগা খিচুড়ি প্রজেক্ট



আমাদের ছক্কুকে চেনেন? না চেনার কথা। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যেমন সবাই চেনেন। তেমনি উদীয়মান প্রতিভাগুলোকেও অনেকেই চিনেন। তবে ছক্কুর বিষয়টা অবশ্য পৃথক। কারন তার প্রতিভা এরিস্টটলের মত এত দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে যে সে কোনটা রেখে কোনটার চর্চা করবে ভেবে পায়না। ফলসরূপ আজ দেখা যায় ও কালো কাপড় গায়ে দিয়ে, চোখে চশমা লাগিয়ে কয়েকজন সাজপাঙ্গ নিয়ে গোয়েন্দাগিরিতে নেমেছে। আবার কালকেই দেখা যায়, সালফিউরিক এসিডে পানি মিশিয়ে তাতে পিতল, তামা দিয়ে ভোল্টার কোষের উন্নয়ন সাধন করছে। আবার কিছুখন পরেই ওকে দেখা যায় খেলার মাঠে একটা ইট ছুড়ে তার গতি, পড়ন্ত বস্তুটির ত্বরণ ইত্যাদি নিয়টনিও গবেষণায় মেতে আছে। পরিশেষে সাপ্তাহ ঘুরতে দেখা যায় সে, গোয়েন্দাগিরি করতে গৃহকর্তা বুঝে ডাকাতির হাতে সব মালামাল দিয়ে ডাকাত বুঝে গৃহকর্তাকে আচ্ছা মত রাম ধোলাই লাগিয়ে হাজতে। ভোল্টার কোষের উন্নয়ন সাধন করতে গিয়ে ঘরে আগুন ধরানো। আর নিয়টনিও গবেষণার ফসল তাঁর চাচার টাঁক মাথায় ভয়ানক রকম একটা আলু বিশেষ তৈরি।

এইতো এবার তো পরিচয় শেষ হল আমাদের ছক্কুর সাথে। ও আমাদের ছক্কুর আর একটা নাম আছে। তা হল ‘ছক্কুদা’। পাড়ার সবার ও ভাই। এমনকি গোপন সূত্রে আমি

জানতে পেরেছি যে, ওর বাবাও নাকি ওকে ছক্কুদা বলে ডাকে।

এতোসব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিল ছক্কুদা।

সে এক বিরাট ব্যাপার। একটা ক্লাব তৈরি করবে সে। কিন্তু ...সিদ্ধান্ত তো আর বেদ বোদান্ত সূত্রনা যে, জপলেই কাজ হবে। এর জন্য অনন্ত নিত্য কাজ করতে হবে। অর্থাৎ কিনা কাজেই সফল। তা সেদিন রাস্তার পাশের সস্তা একটা চায়ের দোকানে স্বচায়ের বলেই ছক্কুভাইয়ের দেখা মিলল। সেই ছক্কুদা। লাল শার্ট, কালো প্যান্ট, সাদা কেডস পায়। প্যান্টটা নিচে একটু ভাঁজ করা। সেখানে গোপাল ভাঁড়ের মত করে দাঁত চেগিয়ে আছে দুটো মোজা। আলাদা নয় একদম মলাট থেকে কেটে এনে নিজের পায়ে সেটে দিয়েছেন। বেচারা পা। ভাগ্যই তাদের খারাপ। পড়বি তো পড়বি এমন লোকের কাছে পড়েছিস যে কিনা, চৈত্র মাসের গরমেও তোকে আপাদমস্তক মোজার আড়ালে মুড়িয়ে রাখবে।

কখন থেকে যে দরজায় দাড়িয়ে মুখে একটা হাত পুড়ে জোরে সোরে মস্তিষ্কের কোনার অফিসে বিরাট পরিসরে চিন্তার জ্বাল বিছিয়ে ...গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি।

ঠিক তখনই কে যেন আমায় বকল। না না ওটাকে বকা বলেনা, ওটা ধমকানি। ধমকানি বললে অন্যায় হবে। নিছক বলা যেতে পারে জ্বোরে ডাক দেওয়া। এটাই সই। কিন্তু ডাকটা দিলকে। ভাল করে চারপাশ তাকালাম। স্টলটা একদম ফাকা – ফকফকা। কোন মানুষ নেই। ও কিরে বাবা মস্তিষ্ক? বেকে বসেছিস নাকি? ওইতো সামনেই দিবি বিরাট ভুড়িওয়ালা একটা লোক বসে আছে। ছক্কু ভাই। ও হ্যা স্ক্যানে ভুল বাবা? এ? ওটা মানুষ নয়?

থাম! বেশ একটা ঝাড়ি দিলাম ওটাকে। দিবি দেখতে পাচ্ছি একটা মানুষ। হাত আছে, পা আছে, নখ আছে, চুল আছে, মাথা আছে, মাথার ভেতরে মস্তক ...

কি বলহে? মস্তক নেই? বেশ ভাল রসিকতা শিখেছ তো?

যা হোক স্পষ্টভাবে আরেকটা ডাক শুনলাম। ছক্কুদার চোঁট নড়ছে। হুম অংক এতখনে মিলল। ডাকছেন ওনিই।

“হ্যারে জগা তুইতো বেশ পাতলা হয়ে গেছিস রে? মনে হচ্ছে হাওয়া দিতেই উড়ে যাবি?” বলে কি ছক্কুদা। পাতলা কি আর সাধে হয়েছে? বাংলা সিনেমায় নাম লিখিয়েছি। পাতলা খান নাম নিয়েছি। তো তো পাতলা হতেই হবে।

“বুঝলি আমি কিন্তু শিগগির বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে নাম লেখাইমু।”

“তা আবার কি গো ছক্কু দা!” পাতলা বলার হালকা পাতলা অপমানটা ভালভাবে পাতিয়ে হজম করে নিয়ে বললাম, তোমার ঐ মোটা খাতাটায় বুঝি তাদের নাম লিখে মাঝখানে

আলগোছে বসিয়ে দেবে বুঝি।

ছক্কুদার হাতে ধরা মোটা খয়েরি রঙ্গের খাতাটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললাম।

“হতচ্ছাড়া, হাদারাম কি বললি তুই?” হাঁসফাঁসে না গিয়ে ফুঁস করে উঠলেন তিনি।

“এই খাতায় নয়, একদম পরিষ্কার সংবাদপত্রে দেখতে পাবি। বুঝলি? কপালখানা প্রসন্ন হলে চার পাঁচটা খাতে নোবেল পেয়েও যেতে পারি। নিদেন পক্ষে ১টা খাতে তো মাস্ট। তখন দেখবি রবীন্দ্রনাথ আর ডঃ ইউনুস এর পাশে আমার নামখানা কিরম করে জ্বলমল করে। হেডিংটা হবে এই রকম, রবীন্দ্রনাথ আর ডঃ ইউনুসের পর নোবেল পেলেন আরেক বাঙালী, নাম ...”

“ছক্কুদা সর্বদালয়।” কথাটা শেষ করলাম আমিই। বলেই কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম।

“আরেকবার কি যেন একটা উপাধি দিলি?” আনন্দের স্বরে বলল ছক্কুদা।

“সর্বদালয়।”

“হুম! তবে ছক্কুদা টা রাখা যাবেনা। বুঝলিরে জগা আগেই নামটাম ভেবে রাখি, পরে সাংবাদিকদের সামনে নাম নিয়ে না একটা কেলেঙ্কারি বেঁধে যায়।”

“ঠিক বলেছ ছক্কুদা। যশের সাথে নামের চেঞ্জ। দেখলেনা আমাদের পাড়ার হাবুটা কিভাবে ব্যবসা করে হাবিবুর রহমান হয়ে গেল!”

উৎসাহ পেয়ে কথা বাড়ালাম আমি।

“হুম! ঠিক কথা।”

বেশ চিন্তিত দেখাল ছক্কুদাকে।

বলু ভাইয়ের হাঁচি



আমাদের পাড়াতো ভাই বলু। আমার নাম মানে ‘পলু’র সাথে ওনার নামের বেশ মিল থাকলেও আদতে ওনার সাথে আমার রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। থাকলেও হয়তো স্বীকার করতাম কিনা কে জানে। কারণ, ওনার মতো পাগলাটে মানুষ এই তল্লাটে আর একটাও নেই।

এইতো সেদিন বলু ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি ওনি কানে ম্যাচের শলা দিয়ে খোঁচাচ্ছেন আর একটু পরপর হ্যাচ্ছে... হ্যাচ্ছে... করে চেচাচ্ছেন।

“সে কি বলু ভাই! আপনার কানে এভাবে খোঁচাচ্ছেন কেন?” প্রশ্নটা করেই ভড়কে গেলাম আমি। ওনি কান খোঁচানো থামিয়ে রাগী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। যেন আমি ওনাকে ভয়ানক খারাপ একটা গালি দিয়েছি।

“আমার কান খোঁচাব না তো তোর কান খোঁচাব?”

শেষমেষ প্রশ্নটা শুনে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাগ্যিস মুখে বলেছেন, হাতে বলেন নি। ওনার আবার মুখের চেয়ে হাত চলে বেশি। অনেক দিন পর দেখা হলে ভালো আছি জিজ্ঞেস করার আগেও ওনি পিঠে এমন একটা চাপড় দিয়ে বসেন যে দু চোখ একেবারে অন্ধকার হয়ে আসে।

যাহোক, আমি বললাম, তা তো ঠিকই। কিন্তু লোকে তো দেখি নাকে খুঁচিয়ে হাঁচি দেয়!
খানিকটা মিনমিনে শুনালো আমার গলা।

“ইয়া ...ইয়া ...পল্টু ...মনে পড়েছে...”

এবার আরও বেশি অবাক হয়ে গেলাম আমি। পাগল হয়ে গেলেন নাকি ওনি? এই দেখি রাগেন এই দেখি আবার হাত পা তুলে নাচানাচি শুরু করেছেন।

এই যখন ভাবছি, দেখি বল্টু ভাই এবার বেশ করে নাকেই নাক খুঁচাতে শুরু করে দিয়েছেন। আর একটু পর পর ধমাম ধমাম একটার পর একটা হাঁচি দিয়ে চলেছেন।

কয়েকমিনিট এভাবে চলার পর ওনি এবার একটু শান্ত হয়ে বললেন, বুঝলিরে পল্টু ...ভুলেই গিয়েছিলাম সব! বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম!

কিসের কথা বলছেন আর কিইবা ভুলে গিয়েছেন কিছু বুঝতে পারলাম না। যদিও খানিকটা কৌতূহল হচ্ছিল তারপরও আমি চুপ করেই রইলাম। কি জানি আবার কি করে বসেন।

“বুঝলি ...আজকে দোকানের হিসেব নিয়ে যেই বসেছি অমনিই মনে হল হাঁচি আসছে।” ওনি বলতেই থাকলেন। আমি শ্রবণে মনোযোগী হলাম। সেইসাথে একটু চিন্তিতও। কালকে টুসিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে ওনার দোকান থেকে শ খানেক টাকা মেরে দিয়েছিলাম। ব্যাটা কি সেই হিসাব ধরে ফেলল নাকি?

“ভাবলাম যে খাতাটা বন্ধ করেই হাঁচিটা দেই। থুথু ছিটিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হিসাবের খাতাটা বন্ধ করে ...” আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক খাতাটা বন্ধ তো হল।

“পুরো দশ মিনিট বসে রইলাম। কত চেষ্টা করলাম। কই হাঁচি? ব্যাটা কই উধাও হয়ে গেছে। তাই আবার খাতাটা খুলে বসলাম.”

আবার আঁতকে উঠলাম। আবার খাতা খোলা কেন?

“খুলতে না খুলতেই আবার হাঁচি এসে হাজির। তাড়াতাড়ি খাতাটা বন্ধ করে যেই আবার হাঁচি দিতে যাব অমনিই আবার লাপান্তা!”

হাসিতে আমার পেট ফেটে যাচ্ছিল। কোনরকমে হাসি চেপে রেখে করুণ মুখ করে বললাম, তারপর? তারপর কি হল বল্টু ভাই?

“হাবলুটাকে ডেকে বললাম, ঐ হাবলু হাঁচি দেয় কেমনেরে?” হাবলু কি জানি খুঁচা খুঁচির কথা বলল দূরে থেকে বুঝলামই না। তাদের নিয়ে হয়েছে আরেক ঝামেলা। গার্লফ্রেন্ডের

সাথে আসতে করে টুকুস টুকুস কথা বলে এমন অভ্যেস গড়ে তুলিস, পড়ে ভাল কথাও এতো আস্তে করে বলিস যে কিছু বুঝাই যায়না। যত নষ্টের গোড়া মোবাইল ...

আমি প্রমাদ গুনলাম। হাতে রাখা মোবাইল পিছিয়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম।

“যাক গো!” হাবলুর কথা বুঝতে না পেরে এইবার আমি গিয়ে ডিটেকটিভ সূত্র প্রয়োগ করলাম। বুঝিস নাকিরে ...ডিটেকটিভ কি জিনিস?

আমি মাথা নেরে সাই দিলাম। গোয়েন্দা।

“হুম! ভাবলাম কোথায় কোথায় খোঁচানো যায়। আমরা কোথায় কোথায় সচরাচর খুঁচিয়ে থাকি। ওপাড়ার দাদিকে দেখতাম দাঁত খুঁচাতে। ভাবলাম দাঁত দিয়েই শুরু করি। ঘন্টা খানেক দাঁতে বেশে করে খোঁচালাম, বুঝলি?” আমি সাই দিলাম।

“দাঁতে খুঁচিয়ে লাভ না হওয়ায় শুরু করলাম কানে খোঁচানো। ভাবলাম গাড়ি যেমন মাঝে মাঝে ঠেলে স্টার্ট করতে হয়, হাঁচিটাও ওরকম কিনা। তাই ‘হ্যাচ্ছো হ্যাচ্ছো’ করেও বার কয়েক চেষ্টা করলাম।”

কিন্তু কাজ হচ্ছিলনা কোনভাবেই।

আর সেইসময়ই না তুই এলি। তোর একটু কথা শুনেই কেমন বুদ্ধিটা খাটলাম বল! সোজা নাকে ঢুকিয়ে দিলাম। আমার যে গোয়েন্দাগিরির গুনটা আছে এইটা আগে থেকে ভেবে দেখিনিরে!

এরপর তিনি বেশ খানিকখন একা একাই নিজের বিভিন্ন গুন নিয়ে আমাকে লম্বা একটা বয়ান দিলেন।

তারপর ক্যাশবাকসো খুলে আমার হাতে নতুন কড়কড়ে একটা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এইটা তোর আজকের কেসের পারিশ্রমিক। বল্টু গোয়েন্দার এসিস্ট্যান্ট হিসেবে আজ থেকে তোকে নিযুক্ত করলাম।

টাকা পেয়ে আমি বানরের মত এমন একটা লাফ দিলাম যে চার্লস ডারউইন বেঁচে থাকলে বানর থেকে মানুষ নয় বরং বলতেন মানুষ থেকেই বানরের সৃষ্টি।

বলু ভাইয়ের ব্যায়াম



সকাল সকাল চোখটা চড়ক গাছে উঠে গেল আমার।

একি! একি দেখছি আমি।

সূর্যতো ঠিকই আছে। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মাটি উল্টে যায়নি তো?

হাতে বার দুয়েক চিপটি কেটে দেখলাম স্বপ্ন দেখছি কিনা!

না ঠিকই তো আছে। তবে?

একি সত্যি?

আমাদের চেনাজানা, পাড়ার ‘শুটকি’ খ্যাত বলু ভাই ইয়া বড় বড় দুটি পাথরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছাদে দাড়িয়ে একবার উপরে তুলছেন আবার নামাচ্ছেন।

তুলছেন তো বটে, তাও আবার অবলীলায়।

“একি বলু ভাই?”

তাকালেন তিনি। তবে তার ব্যায়াম থামলনা।

“বল কি বলবি?”

স্বাভাবিক গলা। ব্যাপারটা কি?

খপ করে একটা পাথরে ধরে ফেললাম। ধরেই চোখ এবার উঠল ডবল চড়ক গাছে।

শোলা! পাতলা শোলাকে ওনি পাথরের মত কেঁটে ব্যায়াম করছেন।

“একি একি করছিস কি? ছাড়!” ভয় পেয়ে ছেড়ে দিলাম!

“বলু ভা...”

“বুঝলিনা!”

কথা শেষ হবার আগেই কথা পাড়লেন ওনি। সাথে একটা চোখ টিপ।

“এত শো ...”

“আরে বুঝলিনা ...”

আরেকটা চোখ টিপ। সেইসাথে পাশের ছাদে ইশারা।

হুম বুঝা গেল ব্যাপারটা।

একটা মেয়ে দাড়িয়ে আছে ওখানে।

“ও, এই ব্যাপার!”

বলু ভাইয়ের ব্যায়াম ততখনে আবার শুরু হয়ে গেছে।

“বুঝলিরে পলু! আমাকে তো আজকাল অনেকেই ‘শুটকি’ বাদ দিয়ে ‘ইবনে সীনা’ ডাকছে!”

চেচিয়ে বলতে লাগলেন। যেন আমাকে নয় ছাদের কোনে দাড়ানো মেয়েটাকাকে শুনাচ্ছে!

“ইবনে সীনা?”

“হুম! চিনিসনি তো? তোই তো ঐ গ্যাদার মার মতো সারাক্ষন, ঐ কি বাংলা ছবি দেখিস! রেসলিং! নাম শুনিছিস তো! দেখতি যদি তবেই চিনতে পারতি। ইয়া ইয়া হাত পা!”

“কিন্তু বলু ভাই, ওতো ‘জন সীনা’!”

মিন মিন করে বললাম আমি।

“জন সীনা না তোর মাথা! ইবনে সীনা! তুই কি আমার থেকে বেশি জানিস?”

তারপর কণ্ঠটা একটু কমে এলো।

“হ্যারে সতিই কি জনসীনা নাকি?”

“তাই তো শুনেছি। আমাদের পাড়ার যে জিকু, পাস্তু? এরা তো হরদমই খালি রেসলিং দেখে! ওদের কাছেই তো শুনেছি।”

আমারও মিনমিনে গলায় বললাম।

“হোক তো জনসীনা!”

আবার চেচালেন বল্টু ভাই।

“তুই না পল্টু!” খালি ঐ পুচকেদের কথা বলিস। আমি বলছি জনসীনা দাদা ইবনে সীনার কথা।

“জনসীনার দাদা ইবনে সীনা! জিকুদের কাছে তো ওনাম শুনিনি?”

শুনেই বাংলা ছবির জাম্বুর মতো হেসে উঠলেন বল্টু ভাই।

তবে আমার কাছে যেন কোথাও কোথাও থাকে আনোয়ার হোসেনের মত লাগল। বিশেষ করে বিখ্যাত হাট অ্যাটাকের সিনের মত!

“জানবি কিরে তুই? দুদিনের ছোড়া। শোন ... শোন তবে বলছি ইতিহাস! খোলেই বলছি তোকে!”

হাত থেকে পাথর খুড়ি শোলাগুলো নামিয়ে রাখলেন পাশে।

“জনসীনার দাদার নাম ছিল ইবনে সীনা। সেকি স্বাস্থ্য তার ছিল! আমার চেয়েও তাগড়া! তার নামে তো একটা হাসপাতালও আছে।”

তার ছেলে হলে ‘ই’ বাদ দিয়ে নাম রাখল, বনে সীনা।

সেই এক মহা পাণ্ডায়ান। এরপর হল দুঃখের দশা! আর কি বলব! তারহল এক রোগা পটকা ছেলে।

সেই না তোদের ঐ কি যেন ছোড়াটার নাম?

“জনসীনা?”

“হুম। ওর নামতো আগে ছিল জনে সীনা। তোর মুখ্য লোক। বিকৃত করে ডাকিস জনসীনা।” আমি মুখ শিটকালাম।

“আর! তোর তো সাহস কমনা, আমাকে কিনা ঐ পুচকে জনসীনার সাথে তুলনা করিস!” বলেই একটা পাথরে খাবড়া দিয়ে বসলেন ওনি।

ওমনি ঐটা ভেঙ্গে শোলা বাতাসে উড়তে লাগল!

এই ফাঁকে আমি পালালাম। কখন না আবার দ্বিতীয় ছোলাটা মাথায় ছুড়ে মারেন?

মাথা ফাঁটার ভয়ে নয়, শোলাটা গুড়িয়ে যাবার ভয়ে। কারন মেয়েটা তখনও ছাদের কোনে ঠায় দাড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল!

টুনুচাচার টুনটুনি রহস্য



টুনু চাচার সাথে রোজ দেখা হয়। বাজারে যে নতুন চা স্টলটা হয়েছে সেখানে প্রতিদিন চা খেতে যাই। সেখানেই দেখা হয়। সাদা পাকা চুল চাচার। চোখে একটা মাস্কাতার আমলের মোটা ফ্রেমের চশমা। ভারি আমুদে লোক। আর আজগুবি সব গল্পের একেবারে যাকে বলে ডিপো।

ধোয়া উঠা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে প্রতিদিন দলবেঁধে শুনি চাচার সে গল্প। অবশ্য ফ্রি নয়। যারা শুনি পালা করে চাচাকে চা খাওয়াই। গতকালকেই শিডিউল করে রাখা হয়েছে, চাচা আজকে শুনাবেন এক টুনটুনি গল্প। সে যেসে টুনটুনি নয়। গল্পের খানিকটা আভাস ইতোমধ্যেই শুনিয়ে রেখেছেন। কোন আমলে নাকি চাচা স্টেশনমাস্টারের কাজ করেছেন। আর সেখানেই সে আজব পাখিটার দেখা পান তিনি। সে পাখি অবশ্য কথা বলেনা। গণক পাখিও নয়। আলিফ লায়লার মত মন্ত্র আওড়ালে যাদুও হয়না তাও আজব পাখি। চাচার মতে ‘খালি আজব নয়! সে এক মারকুটে আজব’।

অবশ্য গল্প শুনার পর আমার কাছে পাখিটার চেয়ে রহস্য লেগেছিলো অন্যকিছু। যাহোক সে কথা পরে বলি। টুনু চাচার সে মারকুটে আজব পাখির গল্প শুনার কৌতূহলে রাতে ভাল ঘুমাতেও পারিনি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দু পাতা ইংরেজি রচনা বাবাকে জোরে জোরে

শুনিয়ে মায়ের টাকার গোপন সঞ্চয় থেকে হেটাকার একটা নোট নিয়ে সোজা ছুট। চাচা এলেন সাতটায়। পশ্চিম পাশে যে নড়বড়ে সাড়ে তিনপেয়ে টুলটা তার বা পাশে একটা হাত ভাঙা কাঠের চেয়ার। এটাই হল চাচার বিশেষ আসন। আমাদের চা খাওয়া ততক্ষণে শেষ। চাচার ধুয়ো উঠা চা প্রস্তুতই ছিল।

চেংড়া বাক্কু চা দিয়ে গঁজো দাঁত গুলো দেখিয়ে বলল, কাহা টুনটুনি ফইকের গল্পটা ইস্টার্ট দেন। চাচা মাথা নাড়েন।

চায়ে সুড়ুং করে একটা চুমুক দিয়ে বলেন, গল্প না, গল্প না।

এগুলো হল স্মৃতি। হু! যাক স্মৃতিই। তাই সই। আমরা মেনে নিয়ে চোখেমুখে কৌতূহল নিয়ে হা করি তাকিয়ে থাকি চাচার দিকে।

চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে ওনি দাড়িতে হাত বুলান কিছুক্ষণ। চশমাটা খোলে অযথায় পাঞ্জাবীর খুটে মুছে আমার চোখে দেন। তারপর শুরু করেন গল্প থুকু স্মৃতি। চাচার আত্মস্মৃতি। চাচার গল্প চাচার ভাষায় না বললে ঠিক জমেনা। তাই চাচার বয়ানেই তুলে দিলাম।

“বাড়িতে দুবেলা ভাতের খোটা সইতে না পেরে শেষমেশ চেয়ারম্যানকে ধরে বারো টাকা বেতনে পোস্টমাস্টারের চাকরিতে বুলে পড়ি। আমার দায়িত্ব পড়ে আমিরগঞ্জ। এখন যেমন লোকে গিজগিজ, দোকানপাট আর কয়েক ঘণ্টা পরপর ট্রেন আসার হিড়িক দেখিস তখন তেমন ছিলনা। স্টেশনটার চারপাশে ছিল অনেকটা দূর জোড়ে ধানি জমি। রেল সড়কটা উঁচু হয়ে চলে গেছে সেই ধানিক্ষেতের মাঝ দিয়ে। আর স্টেশন বলতে একটা কুড়ে। আর যাত্রীদের বসার জন্য একটা ছাউনি। ট্রেন আসতো দুবেলা। একটা সকাল সাড়ে ছটায় আরেকটা রাত দেড়টায়।”

চাচা এবার থামেন। পাঞ্জাবির উপর কোথেকে উড়ে যেন এক টুকরো খড় পড়েছিল। সেটাকে বেশ দু আঙুলে ধরে গড়িমসি করে শেষটায় ফু দিয়ে ঝেড়ে ফেলেন। আবুল মিয়ার কপাল কুচকে আছে। আজকে তার ঘাড়েই পড়েছে চায়ের বিল। যত গড়িমসি তত বেশি কাপ চা। চাচা অবশ্য দ্বিতীয় কাপটা এখনই চাননা। ওনি আবার শুরু করেন,

“কর্মচারী ছিলাম আমিসহ তিনজন। একটা বারো তেরো বয়সী ছেলে আর একজন আমারই বয়সী। অবশ্য এরা ঠিক রেলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। স্টেশন মাস্টারের ঘরটাই আবার ডাকঘর হিসেবেও ব্যবহৃত হত। আমার বয়সী অর্থাৎ হাশেম মিয়া ছিল

পোস্টমাস্টার। আর আনুর কাজ ছিল চিঠিপত্র যাচাই করে আঙনে গালা গলিয়ে সিল করে দেওয়া।”

মূল ঘটনা মনে হয় মাঘের শুরু দিকে। শীতটা নেমেছিল বেশ ঝাঁকে সেবার। কুয়াশাও পড়া শুরু করে সেইসাথে পাল্লা দিয়ে। একদিন হাশেম মিয়ার বাড়ি থেকে চিঠি এলো তার মা ভারি অসুস্থ। এখন যায় তখন যায় অবস্থা। চিঠি পেয়ে হাশেম পড়ল ভারি বিপাকে। সে সদ্য দুদিন ছুটিয়ে কাটিয়ে এসেছে সপ্তাহখানেকও হয়নি। এদিকেও আনুরও সেদিন এলো ঝাঁকিয়ে জ্বর। শেষমেশ চিঠিপত্রের কাজ আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি সকালের ট্রেনে চড়ে বসলেন। বলে গেলেন, অবস্থা ভাল হলে দুদিন বাদেই ফিরে আসবেন। আনু জ্বর নিয়েই চিঠিপত্র সিল-গালা করে সন্ধ্যা হতেই চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়ে পড়ল। এমনতেও আমার দেড়টায় উঠতে হয়। ভাবনা কি। আজ কেবল চিঠির বোঝাটা তুলে দিতে হবে এইযা। কুড়িটার একপাশেই হাশেম মিয়ার বিছানা। ভাবলাম এখানেই একটু গড়িয়ে নিই।

গল্পটার এখানে এসে চাচা আবার চুপ। হাসি হাসি মুখ করে আবুল মিয়ার দিকে তাকিয়ে সাদা দাড়িতে হাত বুলাতে থাকেন। এর অর্থ, দ্বিতীয় কাপটা না এলে গল্পটা আর এগোবেনা। আবুল মিয়া অগত্যা আরেক কাপের অর্ডার দেন। চায়ের কাপে বোধহয় চিনির ব্যাম থেকে একটা মরা পিঁপড়ে পড়েছিল। আঙুল দিয়ে আলগোছে সেটাকে তুলে সন্তর্পণে ঝেড়ে ফেলেন। তারপর চোখ বন্ধ একটা লম্বা চুমুক।

আধ-খাওয়া চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে তারপর মুখ খোলেন,

“চোখ ঠিক কখন লেগে এসেছিল বুঝতে পারিনি। ট্রেনের হুইশেলে ঘুম গেল ছুটে। ছড়মুড় করে উঠে চিঠির ঝুলোটা আর টেবিলে রাখা লঠনটা রেখে বাইরে বেরোলাম। ট্রেন এসে মাত্র দাঁড়িয়েছে। কোন যাত্রী নেই। মাঝে মাঝে যে দু একটা থাকে এই তীব্র শীতে বুঝি তাদেরও ট্রেন চড়ার সাধ মিটেছে। আমি মেইল বগির দিকে এগিয়ে গেলাম। হাশেম মিয়া চাবি দিয়ে গিয়েছিল। চিঠির বোঝাটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আবার তালা দিয়ে ফিরতেই কে যেন ডাক দিল,।”

“টিকিট সাব ...টিকিট সাব!”

একেতে হাতে কেবল একটা লঠন। সেটা দিয়ে এমনতেই দুহাতের বেশি দেখা যায়না। তার উপর আবার ঘন কুয়াশা।

আমি হাঁকলাম,

“কে? কে কথা কয়?”

“আমি সাব। একটু এদিকে আইবেন? বড় বিপদে পড়েছি।” আমি আর কথা না বাড়িয়ে এগোলাম সেদিকে। যাত্রী ছাউনিতে ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে লোকটার চোখের কাছে লঠনটা ধরতেই দেখলাম। একটা হাড় হিড়হিড়ে কঙ্কালসার একটা লোক। মুখে কাচা পাকা গোঁফ দাড়ি। চোখ দুটো যেন প্রায় গর্তে বসে গেছে। পিটপিট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

“একটা টিকিট দেবেন সাব? কিন্তু পয়সা নাই আমার। এই পাখিটা নিয়া যদি দিতেন?”

ভারি অদ্ভুত লোক। মাঝ রাত্রে খাঁচায় একটা টুনটুনি পাখি নিয়ে এসেছে টিকেটের জন্য। লোকটা বেশ বৃদ্ধ। কেমন যেন মায়া হল দেখে।

বললাম, কোথায় যাবেন?

উত্তর এলোঃ দেন একটা। এ গাঁও ছাড়তি পারলেই অয়। গাঁওয়ের মাইনসে দেখতে পারেনা আমারে। ফইক টইক নিয়া থাকি। তাই কয়, পাগল। গাঁওয়ে আর থাहा যাইবনা। সব ফইখ আসমানে উড়াইয়া দিয়া এইডা নিয়া পলাইয়া আইলাম। বড় পছনের ফইখ। বিপদে না পড়লে দিতাম না। দিবেন সাব একটা টিকেট?

ট্রেন হুইশেল দিচ্ছে। দ্রুত একটা টিকিট এনে লোকটাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে লঠনের আলোয় পতাকাটা ঝাঁকতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। ফেরার সময় খাঁচাটা চোখে পড়ল। যাত্রী ছাউনির টুলের এক কোনায় রেখে গিয়েছে। পাখিটার কোন সাড়া পাচ্ছি না।

লঠনের আলোয় ধরতেই দেখলাম এককোণে জবুথুবু হয়ে চোখ বোজে দাড়িয়ে আছে একটা টুনটুনি।

ভাবলাম কাল সকালেই ছেড়ে দেব এটা। খাঁচাটা এনে ঘরের একটা কোনায় ঝুলিয়ে রাখলাম। একেতো হাড় শিরশিরে মাঘের শীত। মোটা কম্বল দিয়ে জুত করে শুয়েই ভাবলাম এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যাবে। সকালে উঠে দেখব আকাশ ফকফকা। কে জানে সূর্য উঠবে কিনা? সে উঠুক আর নাই উঠুক, কুয়াশার পুরো চাদর ভেদ করে দশটা এগারোটা নাগাদ তো একবার উঁকিঝুঁকি মারবেই।

কিন্তু সে আর হলো কই?

তখন রাত আনুমানিক তিনটা কি সাড়ে তিনটা হবে। চোখদুটো যেন আপনিই খোলে গেল। সেইসাথে ঘুমের রেশও যে কোথায় হারাল কে জানে? খুটখুট কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। একটানা নয়। থেমে থেমে। দরজায় কেউ ধাক্কাচ্ছে নাকি? তাইতো!

টেবিলে তখনও লণ্ঠন জ্বলছে। আলো কমিয়ে রেখেছিলাম। ঘরটা জোরে আবছা আবছা আলো। আলমারি, টেবিল, চেয়ার আর টেবিলে রাখা জগটার ছায়া লণ্ঠনের কাঁপা আলোয় ধাপিয়ে চলেছে। এই কনকনে শীতে কম্বল থেকে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া চোর ছেঁচরও হতে পারে।

বিছানা থেকেই আমি হাঁকলাম,

“কে? দরজা ধাক্কায়ে কে?”

“আমি সাব!”

কণ্ঠটা শুনেই কেমন যেন আঁতকে উঠলাম। বৃদ্ধ একটা কণ্ঠস্বর। আর খুব পরিচিত ঠেকল আমার কাছে।

“আমি কে?” নাম বলুন? সাহস করে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম আমি।

উত্তর এলঃ আমি... সাব। সেইযে দেড়টার টেরেনের সময় আপনার সাথে দেখা হল। আমার পাখি নিয়া টিকেট দিলেন?

চাচা আবার চুপ করে গেলেন। আমাদের সবার মুখ হা হয়ে আছে। চাচা পাখি নিয়ে যে লোককে টিকেট দিয়েছিলো সে দু ঘন্টার মধ্যেই আবার ফিরে এলো কিভাবে? কৌতূহল সবার এতটাই বেড়ে গেছে যে আবুল মিয়া চাচা থামার সাথে সাথেই চায়ের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। চায়ের কেটলির পাশে একটা ধুয়োয় কালো হয়ে যাওয়া টুলে বসে হ্যাঁ করে গল্প শুনছিলো চা ওয়ালা।

সে দ্রুত হাতে লেগে গেল চা তৈরিতে। আধ মিনিটের মধ্যেই ধূয়া উঠা গরম গরম এক কাপ এসে গেল টুনু চাচার হাতে। সেটা নিয়ে এবার দু পা চেয়ারে তুলে আরাম করে বসলেন তিনি।

একটা চুমুক দিয়েই আবার গল্প শুরু করলেন,

“আতঙ্কে আমি কেমন যেন জমে গেলাম। এই শীতের রাত্রোও ঘামে প্রায় গোসল করে ফেলেছি। কম্বলটা গা থেকে ঝেঁরে ফেললাম। তারপর কেমন যেন মস্তমুগ্ধের মত উঠে গেলাম দরজায়। দরজা খোলতেই দেখলাম সেই বৃদ্ধটা দাড়িয়ে আছে। সে এক বীভৎস অবস্থা। সারা গায়ে তার চাপ চাপ রক্ত। মাথার সাদা চুল ভিজে লাল। আমাকে দেখে যেন একটু হেসে উঠল।”

তারপর বলল,

“টিকিট সাব টেরেন তো আমারে ফালাইয়া চইল্লা গেল। টিকিট তো কামেই লাগল না। দেন দেখি আমার ফইখটা।” আমি ততক্ষণে পাথর হয়ে গেছি। লোকটা আমার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। বিড়বিড় করে বলছে

“লরে ফইখ যাই...”

খাঁচাটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানটা কেমন অন্ধকারেই ঠাওরে নিল। আমি কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম।

“সাব, খাছা দিয়া গেলাম, ভাঙা চোরা কলকজা খটরমটর! নেওনের দরকার নাই।”

“খাঁচা, পাখি দুইটা নিয়াই বিদায় হও। ঘোর লাগা স্বরে বিড়বিড় করলাম আমি।”

অন্ধকার ফুড়ে লোকটার আবছা ছায়াটা নড়েচড়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

“উপায় নাই সাব। যেই দেশে যাব হেই দেশে টেরেন যায়না। হাওয়ার রাজ্যি। ফইক উইড়্যা বেড়ায়। খাঁছা নেওনের ব্যবস্থা নাই।”

তারপর বিড়বিড় করতে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল লোকটা।

সকালে ঘুম ভাঙলো লোকজনের শোরগোলে।

স্টেশনে বেশ মানুষ জমে গেছে। ব্যাপারটা কি জানার জন্য উঠে বাইরে গেলাম। লোকজনের মুখে হা হুতাশ। একটা শব্দ একটু পরপর কানে আসছে, ‘ট্রেনে-কাঁটা’।

আনুর দেখলাম জ্বর সেড়ে গেছে। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছেরে আনু?

“স্যার একটা লোক মারা গেছে।”

ট্রেনের বারি খাইছিলো মনে হয়। মাথা ফাইট্রা দু ফাঁক! হাঁতে আবার পানের ডগায় গাথা চুন। খাইতে নিছিলো মনে হয়।

আমার মাথাটা কেমন উলটপালট হয়ে গেল। দ্রুত ঘরে ঢুকে গেলাম। টেবিলটার পাশে চাদর দিয়ে আড়াল করা যে আলনাটা।

তার কিনারেই! হ্যাঁ ওটার কিনারেই পাখির খাঁচাটা। যেই খাঁচা তেমনি আছে, শুধু পাখিটাকে দেখলাম পা দুটো আকাশের দিকে ছড়িয়ে শীতে জমে মরে পড়ে আছে। আমি আর দাড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ধপ করে একটা টেবিলে বসে পড়লাম। কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম একটা দৃশ্য।

ভয়ঙ্কর বীভৎস একটা দৃশ্য। লোকটা ট্রেনের দরজায় এসেছিলো পানের পিক ফেলতে। আর সেখান থেকে পা হড়কে পড়ে মৃত্যু!

কিন্তু কালকে রাতে তাহলে কে এসেছিলো? তাহলে কি মৃত্যুর পর ভূত হয়ে লোকটা এসেছিলো টিকেটের মূল্য ফিরিয়ে নিতে?

নাকি সেটা ছিল আমার কোন ভুল! কোন আজগুবি স্বপ্ন!

হা হয়ে শুনছিলাম এতক্ষণ। সত্য কি মিথ্যা জানিনা। কিন্তু গল্প শেষ করার পর চাচাকে কেমন উদাস মনে হল। কত আজব ঘটনাইতো ঘটে পৃথিবীতে! কে জানে এটাও হয়তো তেমন কোন ঘটনা। যেটা রহস্য থেকে শুরু রহস্যেই শেষ!

তিনটি দৃশ্য ও একটি আংশিক প্রেমের গল্প



এক

নিমের মাজন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে আরেকবার মিয়া বাড়ির আওতার উপর দিয়ে উঁকি মারে সুজন। উঠোনের অর্ধেকটা চোখে পড়ে। একপাশে চট বিছিয়ে তাতে ধান আর মরিচ রোদে দিয়ে এখনও বিমুছে জাও বুড়ি। বড় মিয়ার কোন দূরসম্পর্কের বোন। বাড়ি ঘর কিছুই নেই। চাকরানীর মত পড়ে থাকে মিয়া বাড়িতে।

বুড়ির দাঁত নেই, ফোকলা দাঁতে ভাত খেতে পারেনা বলে নরম করে ‘জাও’ রেঁধে খায়। সেই থেকে এখন নামই হয়ে গেছে ‘জাও বুড়ি’।

দাঁতমাজতে উশখুশ করে সুজন। আড়চোখে আশপাশটা দেখে দ্বিতীয়বার উঁকি দিতেই ‘হুশ হুশ’ করে উঠে বুড়িটা। ওর কলজে শুকিয়ে যায়। দেখে ফেলল নাকি?

ভয়টা কাটে একটু পরেই। দেখেনি! ধানে মুরগী লেগেছিলো। তাই তাড়িয়েছে।

না! আজকে বোধহয় আর উপায় হবেনা।

দাঁতন করতে করতে পুকুর ঘাটের দিকে এগোয় ও। গেল কোথায় আজ?

কার খোঁজ করে ও? মিয়াবাড়ির আওতার বাইরে বেলীর বুপে দাড়িয়ে কাকে দেখার আশায় উঁকি মারে সুজন?

অবৈধ, নিষিদ্ধ একটা কাজে এত টান কেন ওর?

ভাবে সুজন। জানে বিপদ। তারপরও! নুরু মিয়ার বউকে ভাল লাগলে ও কি করবে?

এক গাদা ছবি লেপটানো ওর মনে। ভেজা চুলে এলোকেশী কিংবা ঘামে ভেজা হাসি হাসি মুখের ছবিগুলো দিনরাত যদি বায়স্কোপের মত ওর চোখের তারায় নাচে কীইবা করবে ও।

ছয়মাস হল নুরু মিয়া দুবাই। এমন বউ রেখে ক্যামনে থাকে কে জানে?

পুকুর ঘাটে এসে মুখ ধোয়ে ওজুটাও সেরে ফেলে।

এ অভ্যাসটা সুজন পেয়েছে তার দাদার কাছ থেকে। তার বয়স তখন কত হবে, ছয় কি সাত।

দাদার সাথে ঘাটে আসত গোসল করতে করতে। দাদাকে ওজু করতে দেখে সুজন প্রশ্ন করত, কি কর দাদা?

দাদা নাকে পানি দিয়ে সাফা করতে করতে বলতেন, এইডারে কয় ওজু দাদু ভাই। হগল কাজের আগে ওজু কইরা নিবা। কু চিন্তা মাথা থেইক্কা বাইর হইয়্যা যাইব।

সুজন ওজু করে। তাও তার তার মাথা থেকে নুরু মিয়ার বউয়ের ছবি যায়না।

‘হালার শয়তান আমারে ছাড়েনা ক্যান?’

বিড়বিড় করে ও। ঘাট থেকে উঠে বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

একটা লম্বা মেঠোপথ চলে গেছে সোজা উত্তরে। পথের একপাশে আম জাম, তেতুল আর বাঁশের ঝাড়ের জঙ্গল। অপর পাশটা খালি। খোলামাঠে কাঁদা পানিতে জাম্বুরা নিয়ে ফুটবল খেলতে নেমেছে ছেলের দল। মাঠের পাশের বড় কদমগাছটার নিচে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ খেলা দেখে ও। মাঠের ওপাড়ের ছোট রাস্তাটা পেরোলেই মিয়াবাড়ি। ভাবে আরেকবার দেখে আসবে নাকি?

দুই

মা বলেন, কিরে তোর বাপে কই?

সুজন রা করেনা। চুপচাপ ঘরে ঢুকে বেড়া থেকে শীতলপাটিটা নিয়ে মেঝেতে বিছিয়ে শোয়ে পড়ে। তাঁতে বসে লুঙ্গী বুনতে বুনতে কথা বলছিল মা।

এবার বুনন থামিয়ে বলেন, কিরে তোর বাপে কই গেছে? বাজার করতে গেছে বিয়ান বেলায়, এহনতো বেইল মাথার উপর। রান্নাম কহন?

সুজন এবারও রা নাই। মায়ের চোঁচামেচিতে খালি একবার ওপাশ ফিরে শোয় ও।

সুজনের মতে ওর বাপটা একটা ‘হারামি’। কাজ কর্ম করেনা, বউয়ের রোজগারে ফুর্তি আমোদ করে।

সকালের দৃশ্যটা মনে পড়ে ওর। নলী আনতে মহাজন বাড়ি গিয়েছিল। দেখে কিনা মহাজনের বউয়ের সাথে হেসে হেসে পিরিতের আলাপ জুড়ে দিয়েছে ওর বাপ।

‘হ, আইব বাজার নিয়া! দেখ গিয়া মাগীর লাইগ্যা তেল, চুরি আইন্যা টেহা উড়াইয়া দিছে এতক্ষণে’ বিড়বিড় করে সুজন।

সুজনের রা নাই দেখে তাতের গর্ত থেকে উঠে আসেন মা।

“কিরে? বিড়বিড়াইয়া কি কস? উত্তর দেসনা ক্যারে?”

মায়ের কথায় মূহুর্তেই রাগ চড়ে যায় ওর। বাপের রাগ গিয়ে মায়ের উপর। সপাং করে মেঝের এক কোনে রাখা কুপিটা ছুড়ে মারে দরজার বাইরে।

তারপর খেঁকিয়ে উঠে, ঘুমাইতেছি দেহস না? এত প্যাঁর প্যাঁর কিয়ের তোর?

ভয়ে কুকরে হতভম্ব মা তাতের খুঁটিতে ভর দিয়ে পাথর হয়ে দাড়িয়ে থাকেন কেবল।

তিন

“দোস্তু খবর হ্নছুনি?”

চায়ের স্টলে বসে সুরং করে চায়ে চুমুক দিয়ে বলে শাজান।

“কিয়ের খবর?”

“নুরু মিয়াতো দেশে আইতাছে। আইজ রাইতেই ফেলাইট।”

“কসকি? হেদিন না মাত্র গেল?”

ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় সুজনের। হীরাভাবীর ব্যাপারটা জেনে গেল নাকি?

“হেদিন কইতো। আধা বছরের উপরে হইছে। আর তুমি যেন দোস্তু এহনও দুখের শিশু। এমন বউ রাইখ্যা কেউ বেশিদিন বাইর থাকতে পারেনি?”

সুজন চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে দেখে তার হাত কাঁপছে। ব্যাপারটা শাজানকে বুঝতে দেয়া যাবেনা।

‘যাই দোস্ত, বাইতে কাম আছে’ বলে হুট করে চা স্টল থেকে বেড়িয়ে আসে ও।

নুরু মিয়া চইল্যা আসতেছে! ভাবতে এত খারাপ লাগছে কেন তার? মাথা ঘুরাচ্ছে ভন ভন করে। নেশাখোরের মত এলোমেলো পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বাজার পেড়িয়ে মেঠো সড়কে উঠে পড়ে ও।

চোখের সামনে ভেসে উঠে হীরা ভাবীর ছবি। হীরা ভাবী ওর কে? তার জন্য এত আকুলি কেন তার?

ভাবনা আছে, কুল নাই। এইযে মেঠো সড়ক এই সড়কের আরেকটু গেলেই মাঠ। মাঠের উপারে মিয়া বাড়ি। আর মিয়া বাড়িতে থাকে হীরাভাবী। সহসা সুজনের ইচ্ছে হয় এক দৌড়ে পৌঁছে যায় সেখানে। হাত ধরে বলে হীরা ভাবীকে জানায় ওর মনের কথা। ওর জন্য তার কতটান, কত মহব্বত। সব খোলে বলে হালকা করে নেয়ে নিজেকে।

দিকনা ফিরিয়ে, মগজে চেপে রাখা কথার কিলবিল করা তো কমবে!

রাস্তার পাশে প্রকাণ্ড একটা তালগাছ। সেটার মাথায় খিলখিলিয়ে হাসছে একটা মস্ত চাঁদ। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজন।

অত উঁচু চাঁদটা ছোঁয়ার সামর্থ্যই তার নেই!

বাংলোর রহস্য



নির্জন বাংলাটায় ঢুকেই শির শির করে উঠল আসিফের শরীর। পুরনো পুরনো একটা গন্ধ সর্বত্র।

চারদিকে দেখলেই বুঝা যায় বহুদিনের পড়ে থাকা বাংলাটা পরিষ্কার করার কোন ত্রুটি করেনি কর্মচারীরা। তাও এর গায়ে পুরনো পুরনো ভাবটা থেকেই গেছে।

আসিফ। ছোট্ট একটা কাজে এসেছে এখানে। সপ্তাহ খানেক অবশ্য তাকে থাকতে হবে। কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে এলাকাটায়। খুঁড়াখুঁড়ি কাজ চলছে। সেগুলোর তদারকির জন্যই তাঁর এখানে আসা।

বাংলাটা একেবারে খুব একটা বড় নয় আবার ছোটও নয়। মাঝামাঝি আকারের। একটা হলরুম। পুরো নিচতলা জুড়ে হলরুম। একপাশে একটা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দু তলায়।

মালপত্র নিয়ে আগে আগে চলেছে রোগা পটকা বৃদ্ধ একটা লোক। বাংলোর কেয়ারটেকার। উদ্ভট একটা নাম লোকটার। হাবিরা। উপজাতি নাম।

ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে উপরে উঠে গেল হাবিরা। সম্বিত পেয়ে ওঁর অনুসরণ করল আসিফ।

দুতলা নিচতলার তুলনায় একটু ছোট। একটা বেডরুম সাথে বাথরুম। সাথে লাগোয়া ল্যান।

মালপত্র ঘরে রেখে নিচে নেমে গেল হাবিরা।

ফ্রেশ হওয়ার জন্য বাথরুমে এসে ঢুকল আসিফ। আধুনিক স্টাইলের বাথরুম। সম্ভবত পরবর্তিতে তৈরি করা হয়েছে এটা।



“আচ্ছা হাবিরা! শুনেছি বাংলাতে নাকি ভূত আছে?”

থেতে প্রশ্নটা করল আসিফ। এখানে আসার আগে এই কথাটা তাকে অনেকবার শুনতে হয়েছে।

বাবা, মা এমনি ওর ছোট বোন তিতলীও আসার সময় এ ব্যাপারে গাইগুই করে কি যেন একটা বলেছিল।

ভূতে অবশ্য আসিফের বিশ্বাস নেই।

“কেউ কেউ তো বলে স্যার!”

পাশে লণ্ঠন না নামিয়ে রাখল হাবিরা।

উপজাতি হলেও লোকটা তো দেখছি বেশ ভালই বাংলা বলতে পারে। ভাবল আসিফ।

“লোকে বলে বলতে তুমি কখনও দেখোনি?”

একটু অবাক দেখাল আসিফের মুখ।

“ঠিক দেখিও নি যে তাও নয় স্যার। তবে এসবে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু তাও একটা ঘটনা আমাকে খুবই অবাক করেছে ...”

বড় বড় শব্দগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলতে লাগল হাবিরা।

“কি ঘটনা?”

প্লেট থেকে হাত তুলে রাখল আসিফ। একটা ইন্টারেস্টিং ভৌতিক গল্প শুনার জন্য সজাগ হয়ে উঠল ওর মায়ু।

“তেনন কিছু না স্যার। তবে...”

“ভৌতিক কিছু নাকি?”

“ঠিক ভৌতিক কিনা বলতে পারবনা স্যার। তবে বেশ রহস্যময় বলে মনে হয়েছে আমার।”

“রহস্য!”

না চাইতেও শব্দটা বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

“জি স্যার। সেটা প্রায় বছর দেড়েক আগের কথা। সবেমাত্র বাংলা মেরামতের কাজ চলছে।”

আমিও তখন চাকরিতে নতুন মাত্র যোগ দিয়েছি ...

বলতে লাগল হাবিরা। নিশুপ রাত। বিরান ভুমির বাংলাটায় লঠনের মৃধু মৃধু আলোয় পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে উঠেছে তখন।

“সময়টা ছিল বর্ষাকাল। এই আকাশ ফর্সা এই মেঘাচ্ছন্ন।” আমি অবশ্য রাতের বেলায় তখন বাংলাতে থাকতাম না।

থাকতাম দূরের একটা হোটেলে। কিন্তু একদিন বেশকিছু দামি জিনিসপত্র এখানে আনার কারণে আমাকে এখানে পাহাড়ার জন্য থেকে যেতে হল।

৮টার দিকে আমাকে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে কর্মচারীরা বিদায় নিল।

সদর দরজা বন্ধ করে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি অমনি একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল আমার।

মনে হল কেউ উপর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

“ইন্টারেস্টিং! ভয় ভয় নিশ্চয় লাগছিল তোমার?”

নাক গলানোর মত করে বলল আসিফ।

“ভয় ভয় অবশ্য লাগছিল তবে পান্ডা দিলাম না।”

হলরুমের এক কোণায় বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। ঠিক সেসময় শুরু হল দমকা বাতাস আর বৃষ্টি। কখন যে চোখটা বুঝে এসেছে বুঝতেই পারিনি।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গেগেল। পাশে থাকা লন্ডনটাও দেখলাম নিভে গেছে। বৃষ্টি ততখনে থেমে গেছে। থেমে গেছে বাতাসও। বাইরে অজ্ঞাত কিছু প্রাণীর ছোটখাটো হাক ডাক ছাড়া একেবারেই নিশুপ।

হঠাৎ করেই আমার মনে হল কেউ সিঁড়িতে হাঁটছে। ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ। স্পষ্ট শুনলাম। একবার দু বার অনেকবার। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আমার। এতরাতে সিঁড়িতে কে হাঁটে। চোর নয়তো?

কেন জানি নিজের যুক্তি নিজের কাছেই বিশ্বাস হলনা আমার।

একটু থামল হাবিরা। আসিফ হাত ধুয়ে নিচে মেজেতে এসে হাবিরার মুখোমুখি বসল।

“তারপর!”

“আমি সাহস করে উঠে বসলাম। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম সিঁড়ির দিকে। একটা ছায়ামূর্তির মত কিছু একটা চোখে পড়ল। সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলাম: কে? কে ওখানে।”

ছায়ামূর্তিটা একটুও নড়লনা। কোন উত্তরও করলনা।

একটা ভয় ঢুকে গেল আমার মনে। চোর নয় এটা। চোর হলে দাড়িয়ে থাকত না। পালিয়ে যেত।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম: কে? কে আপনি?

কিছুটা ভয়মিশ্রিত গলা এবার।

উত্তর এলঃ আমি।

ভয়ের একটা শীতল শ্রোত বয়ে গেল আমার মেরুদণ্ড দিয়ে।

অনেক কষ্টে জিজ্ঞেস করলাম: আমি আমিকে?

হঠাৎ একটা তীব্র আলোকছটা আমার চোখ ধাঘীয়ে চলে গেল। এলিয়ে পড়লাম আমি।

“ও! ইশ লষ্ঠনের আলোটা থাকলেই তুমি ভূতের মুখটা দেখতে পেতে।”

অবিশ্বাস আর রসিকতার সুরে বলল আসিফ।

“বিশ্বাস করেন আর নাই করেন স্যার ঘটনা কিন্তু সত্যি!”

“তারপর কি হল?”

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল ও।

“সকালে জেগে উঠলাম আমি। তবে একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম আমি!”

“কি দৃশ্য!”

একটু কৌতূহল অনুভব করল আসিফ।

“দেখলাম একটা গলা কাটা লাশ পড়ে আছে মেঝেতে।”

“ও!”

প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে আসিফের!

“একটু একটু করে লাশটার কাছে এগিয়ে গেলাম। আর জানেন স্যার তখন কি দেখলাম?”

“কি?”

“এইষে?”

আসিফ বিস্মরিত চোখে হাবিরার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার মাথাটা ভয়ঙ্কর ভাবে গলা থেকে কেটে আলাদা করা। কাঁটা মাথাটা সে বলের মত লোফালুফি করছে!

হাটবার



সপ্তাহান্তে একদিন কদমতলীর হাট বসে। মেঘনার পাড় ঘেসে জমে উঠা এতোবড় হাট আর আশেপাশে দুদশ গ্রামে নাই। সুতরাং প্রতি সোমবার আশপাশের গ্রাম কি দূর-দুরান্তের গ্রাম সব জায়গা থেকে মানুষের ঢল নামে এই হাটে। উৎসব উৎসব আমেজে চলে বেচাকেনা। বড় বড় নৌকা নিয়ে আসে ব্যাপারিরা। নৌকায় নৌকায় ঘাট ভরে যায়। সারাদিন হাট ঘুরে ব্যাপারিরা জিনিসপাতি কিনে বোঝাই করে নৌকায়। হাট থেকে কেনা জিনিসপত্র তারা দূরদুরান্তের গ্রামের ছোট ছোট বাজারগুলোতে বিক্রি করবে।

নদীর পাড় ধরে আসে হাটুরে মানুষের দল। হাটুরে দলের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক। দূর গ্রাম থেকে খেতের ফসল একটু বেশি দামে বিক্রি করার আশায় এতোটা পথ মাথায় বয়ে নিয়ে আসে তারা।

বশির মিয়ার বাড়ি গেহেরগাঁও, কদমতলী হাট যেখানে বসে সেখান থেকে ঘন্টাখানেকের রাস্তা। নদীর পাড় ধরে সোজা হাটা পথ। চাইলে অবশ্য নৌকাতেও আসা যায়, কিন্তু মণখানেক মিষ্টি আলুর বস্তা নিয়ে ভাড়া দিয়ে নৌকায় আসা পোষায় না। তাছাড়া কোথায় যেন ইজ্জতেও লাগে তাঁর। মনে মনে ভাবে “এইটুকান রাস্তা যদি না আটতে পারলাম কিয়ের কিষাণের পোলা আমি”। এক হাতে মাথায় রাখা বস্তার মুঠি ধরে অপর হাতের হারিকেনটা

নাচাতে নাচাতে দ্রুত পা চালায় সে। আজকে একটু সবরে সবরে হাটে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর। দেড়ি করে ফেললে হাটে খুচরা বেচার জায়গাটায় আর ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবেনা। ব্যাপারিরাও এই সুযোগটার তালে তালে থাকে। যেই দেখে কোন কৃষক খুচরা বেচার জায়গা পাচ্ছেনা, অমনি দর কমিয়ে হাকায়। কতখন আর বস্তা মাথায় নিয়ে ঘুরা যায়, শেষমেষ ব্যাপারির দামেই বিক্রি করে দিতে হয়।

হাঁটে বোচাকেনা শেষ করতে বেশ রাতই হয়ে গেছে আজ। রাতের অন্ধকার নামার সাথে সাথে হাটের ভীড়ও কমে গেছে অনেক। হাটুরে মানুষদের অধিকাংশই বেলা থাকতেই হাটের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে গেছে। এখন রয়ে গেছে ব্যাপারির দলটা আর বশির মিয়ার মতো খুচরা বিক্রেতা যাদের বিক্রি করতে একটু দেড়ি হয়ে গেছে এমন কয়েকজন লোক।

বস্তাটা গুছিয়ে নিয়ে হারিকেনের আলোতে টাকাগুলো গুনে রাখে ট্যাকে গুজে রাখে বশির। তারপর বগলের নিচে বস্তাটা চেপে, একহাতে হারিকেনের আলোটা একটু চড়িয়ে নিয়ে সবে হাঁটা ধরেছে এমন সময় যেন কেউ পেছন থেকে ডাকে,

- বশির ভাই নি, ওড়া?

ফিরে তাকায় বশির। হারিকেনের আলোটা উচু করে ধরে।

- কেও? আমিনা নি?

হারিকেনের আবছা আলোয় চেহাড়া ভালোভাবে না দেখা গেলেও মানুষটাকে চিনতে তেমন কোন সমস্যা হয়না ওর।

- হ ভাই... বাড়ির দিক যাবা নাকি?

বশির আর আমিনের বাড়ি পাশাপাশিই। এতেরাতে একা একা বাড়ি ফিরতে হবে ভেবে মনে মনে কিছুটা যেন ভয়ে ভয়েই ছিলো বশির। তাই আমিনকে পেয়ে বেশ খুশিই হলো সে। যদিও এটা কথায় প্রকাশ করলোনা।

- হ, আর যামু কই?

যথাসম্ভব গম্ভীর স্বর করেই বললো সে।

- তাইলে লও ভাই। একলগেই যাই।

হাঁটা শুরু করলো ওরা দুজন। বশির আর আমিনের বাড়ি পাশাপাশি হলেও সম্পর্কটা ওদের খুব একটা ভালোনা। এইতো কয়েকদিন আগেও বশিরের গরু দড়ি ছিড়ে গিয়েছিলো আমিনের ক্ষেতে। এই নিয়ে যা ইচ্ছা ভাষায় তাকে গালাগালি করেছে আমিন। বশিরও অবশ্য যে চুপ করে বসে ছিলো তাওনা। গালির উত্তরে সেও আমিনের চৌদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করতে

ছাড়ে নাই। রাগের মাথায় একটা আধলা ইটও ছুড়ে মেরেছিলো আমিনের দিকে। সে ইট গিয়ে লাগে আমিনের মাথায়। এরপর থেকেই আর তাঁদের মধ্যে তেমন দেখা সাক্ষাৎ নাই।

আলুর বাজার পেরিয়ে পাটের বাজার, এরপরে কাচাবাজার, কাচাবাজারের গলিটা পাড় হয়ে বেরোলেই নদীর ঘাটের দিকে চলে গেছে রাস্তা। হাটের ভেতরের গুমোট আবহাওয়ার এখানেই শেষ, নদীর পাড় ঘেসে আসা মুক্ত বাতাস লাগে দুজনের চোখে মুখে। মিষ্টি আলু আজ ভালো দামে বিক্রি হয়েছে। অন্তত আগামী একটা মাস বউ বাচ্চা নিয়ে নিচিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবে বশির। তাই বাতাসের ঝাপটায় মনটা বেশ ফুরফুরা হয়ে উঠে। নদীর ঘাট অন্ধি চলে এসেছে ওরা। ব্যাপারীদের নৌকা ছাড়ার তোড়জোড় চলছে। একসাথে সবাই বেরোতে গিয়ে একজনের নৌকার সাথে আরেকজনের নৌকার লাগছে ঠুকাঠুকি। এই নিয়ে বেশ একটা চেচামেচিও বেধে গেছে। মাঝিদের কোলাহলে কয়েকদিন আগের ঝগড়ার কথাটা মনে পড়ে বশিরের। সংসারের চিন্তা এখন মাথায় নেই, তারউপরে আবার নদীর পাড়ের বাতাসে মনটা নরম হয়েই ছিল। তাই একটু আগেও প্রচণ্ড বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকানো আমিনের প্রতি কেমন যেন মায়া হয় তার। মনে ভাবে, কতইবা বয়স হবে আমিনের। হিসেব করলে তার বড় ছেলের বয়সী। এই বয়সে মানুষের রক্ত গরম থাকে, নিজের ক্ষেতে আরেকজনের গরু ঢুকলে রাগতো উঠবেই। আর সেই রাগের মাথায় না হয় দুইটা গালি তাকে দিয়েছেই আমিন, সে চুপ করে থাকলেই পারতো। আচ্ছা গালাগালি পর্যন্তও ঠিক আছে, কিন্তু ইটটা ছুড়ে মারা কি কোন প্রয়োজন ছিল? এইটা খুব বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মনে মনে যেন অনুশোচনা হয় বশিরের। ঘাট পেরিয়ে অনেকটা পথ চলে এসেছে ওরা। হাটের কোলাহল এখানে নেই। নিরব নিশুতি রাত, হারিকেনের আলোয় পথ চলতে থাকে ওরা।

- আমিনা! ব্যাতা বেশি পাইছিলি সিদিন?

গভীর নিরবতার মধ্যে হঠাৎ করে কথাটা ছুড়ে দেয় বশির।

আমিন আপনমনে কি যেন ভাবতে ভাবতে হাটছিলো। হঠাৎ বশিরের কথায় চমকে উঠে সে।

- কিয়ের ব্যাতা বশির ভাই?

বশির ঠিক কি ব্যাপারে কথা বলছে ঠাওর না করতে বলে উলটো প্রশ্ন ছুড়ে আমিন।

এমনিতেই ব্যাপারটা নিয়ে একটা সংকোচের মধ্যে ছিলো বশির। আমিনের প্রশ্নে যেন সংকোচ আরো বেড়ে যায় তার। মনে মনে ভাবে কথাটা এখন না তুললেই পারতো।

- ঐষে, ঐদিন রাগের মাতার আতটা ঝাড়া দিলাম আর ইটটা ছুইটা গিয়া মাতায় লাগলো তোর!

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যথাসম্ভব নিজের দোষ ঢেকে ব্যাখ্যা দেয় বশির।

“অ আইচ্ছা। ঐ কতা কও।”

যেন ঘটনা কয়েকদিন আগের নয়, বহু বছরের কোন বিস্মৃত স্মৃতি এমনভাবে বলে আমিন।

- আরে না বশির ভাই। ইটুনি লাগছিলো। সাইর্যা গেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

এরপর খানিকটা সময় দুজন আবার চুপচাপই হাটে। আমিনের যেন এবার ঝগড়ার কথাটা মনে পড়ে। এতোখন সময় বুঝি চুপ করে সে এইব্যাপারটাই চিন্তা করছিলো। তাই এবার নিরবতা ভাঙ্গে সেই-ই।

- বশির ভাই, আসলে আমারই দোষটা বেশি। তুমি মুরুব্বি মানুষ আমার বাপের লাহান। তোমারে মা বাপ তুইল্লা গাইল দেয়াটা খুব খারাপ অইছে।

প্রচন্ড অনুতপ্ত ব্যাক্তির মতো অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করে নেয় আমিন। ওর কথায় যেন বশির বেশ উত্ফুল্ল হয়ে উঠে। আমিনের কাছে নত হয়ে গেছে ভেবে মনে মনে এতোখন নিজেকে বেশ কষে গালিগালাজ করছিলো সে। আমিন দোষ সম্পূর্ণ নিজের কাধে তুলে নেওয়ায় ব্যাপারটাকে এক ধরনের জয় হিসেবে দেখে বশির।

- অইলো অইলো! ইগুলা কিছুনা। তোরে আমি আমার পোলার মতই দেখি।

কথায় কথায় অনেকটা পথই চলে এসেছে ওরা।

নদীর পাড়ের রাস্তাটা এখানে শেষ। এবার ডান দিকে ঘুরে আবাদি জমির চর, এই চরটা পেরোলেই পথটা চলে গেছে আরেকটা খোলা ঘন গাছগাছালি বেষ্টিত মাঠের মধ্যে দিয়ে। এই মাঠের একপাশ লাগোয়া গ্রামের যে বড় কবরস্তানটা সেটার মাঝখান ধরে চলে গেছে একটা মেঠোপথ। সেটা দিয়ে মিনিট পাঁচেক গেলেই গ্রামের শুরু।

আবাদি জমির চরটা পেরিয়ে গাছপালা বেষ্টিত মাঠটার মধ্যে প্রবেশ করতেই যেন পরিবেশটা বদলে যায় সহসা। এতোখনের ফুরফুরে বাতাসটা মিলিয়ে গেছে যেনো হঠাৎ করেই। তারবদলে কেমন যেন গুমোট মেরে আছে সব। একটা গাছের পাতা নড়ছেনো, যেন সবকিছু থেমে আছে কোন কিছু একটা ঘটবার জন্য। উন্মুখ হয়ে যেন অপেক্ষা করছে।

আমিনের সাথে ঝগড়া, একটু আগের আমিনের স্বীকারোক্তি আর তাতে পাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত বিজয়ের আনন্দ যেন আর অনুভূত হয়না বশিরের। কেমন যেন একটা ভয়ের

রেশ চেপে ধরে তাঁকে। জায়গাটা খুব একটা ভালোনা। রাত বিরেতে ভূত প্রেতের আড্ডা হিসেবেই পরিচিত। এইতো বছরখানেকও হবেনা এই মাঠেই পাতা কুড়াতে এসেছিলো শাজাহানের ছোট মেয়েটা। ভর সন্ধ্যা তখন। হঠাৎ করে মেয়ের চোখ পড়ে একটা গাছের উপর এক মহিলা বসে বসে যেন গুনগুন করে কাঁদছে না গান করছে। পড়নে সাদা ধবধবে শাড়ি। কাছাকাছি যেতেই মহিলা হঠাৎ করে ফিরে তাকালো মেয়েটার দিকে। আগুনে পোড়া শরীর, বীভৎস মুখ। মুখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেড়িয়ে আসছে। নিঃশ্বাসের সাথে আগুনের গরম বাতাস এসে লাগলো মেয়েটার শরীরে।

সেই রাতেই এলো গা কাঁপিয়ে জ্বর। পরদিন ফজরের ওয়াক্তের আগেই মারা গেলো মেয়েটা।

মৃত্যুর সময় পাশেই দাঁড়ানো ছিল বশির, জ্যান্ত গায়ে আগুন জ্বেলে দিলে মানুষ যেমন করে ঐরকম করেই তরপাতে তরপাতে মরেছিলো মেয়েটা।

সে দৃশ্য চোখে ভাসলে এখনও ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায়।

ভয়ের কারণেই চলার গতিটা বেশ বাড়িয়ে দিয়েছে বশির। ওর সাথে হাঁটা সামলাতে না পেরে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলো আমিন। সে খানিকটা দৌড়ে এসেই বশিরের সাথে তাল মেলালো।

- বশির ভাই। আসতে আটো। কুলাইতে পারিনা তোমার লগে।

হাটার গতি থামায় না বশির।

- জায়গাটা ভালানা আমিনুদ্দি। জলদি পারহ। নিশুতি রাইতে এই জায়গায় তেনারা থাকে।

গলার স্বর নামিয়ে বলে বশির। যেন কেউ শুনে ফেলার ভয় করছে সে।

- তেনারা কারা বশির ভাই? ভূত?

আমিন কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে বশিরের।

- চুপ! নাম নিছনা! নাম নিছনা!

- নাম নিলেই কি অইব বশির ভাই? তেনারা নাইমা আসব?

গলার স্বর যেন কেমন বদলে যায় আমিনের। খপ করে একটা হাত দিয়ে বশিরের হাতটা ধরে ফেলে সে। তারপর যেন খানিকটা জোর করে বশিরকে থামিয়ে দেয়।

- কি করস আমিনা। বাড়িত যাবিনা?

- বাড়িতই তো আছি বশির ভাই! ওইয়ে দেহ নতুন একটা কবর, ঐটাই আমার ঘর এহন!

আমিনের কথায় বেশ ভয় পেয়ে গেছে বশির। কাপা কাপা হাতে কোনরকমে হারিকেনটা ধরে রেখেছে সে। মুখ কাপছে থরথর করে। বুকের খুকপোকানির কারণে কি যেন বলতে গিয়েও পারছেন।

- তুমি আধলা ইটটা ছুইড়া মারলা। আমার মাতা গেলো ফাইটা! কত যে রক্ত গেলো বশির ভাই। আর কিযে বেদনা কি কমু তোমারে! হেই বেদনাতেই আমি মরলাম!

- তু তু... ইনা কইলি সাইর্যা গেছে?

- সারছেইতো। যেই মরছি আর তো বেদনা নাই বশির ভাই।

বশিরের হাত ক্রমেই কেমন যেন অবশ হয়ে আসতে থাকে। হাতের হারিকেনটা মাটিতে আছড়ে পড়ে হঠাৎ। বুকের মধ্যে চিনচিনে একটা ব্যাথা যেন ধীরে ধীরে তীব্র থেকে থেকে তীব্রতর হতে থাকে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। তারপর নেমে আসে গভীর অন্ধকার!

পরদিন ভোরে বশিরের লাশ পাওয়া যায়।

এই ঘটনার পর বেশ অনেকদিন কেটে গেছে। গ্রামের মানুষের মুখে মুখে বশিরের মৃত্যুর কাহিনীর কথা ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে এসেছে।

এর মধ্যেই একদিন রাতে যাত্রা দেখে বাড়িতে ফিরছিলো আমিন। গভীর অন্ধকার রাত। আকাশে বেশ মেঘ করে বিজলি চমকাচ্ছিলো অনেকখন ধরেই। নদীর পাড়টা পেরিয়ে সবে মাঠের মধ্যে কেবল ঢুকেছে আমিন অমনি শুরু হলো বৃষ্টি। দ্রুত বাড়ি ফেরার জন্য চলার গতি বাড়ালো সে। বেশ ঢল শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাট ভিজে একাকার এরমধ্যেই। হঠাৎ করে কিসের সাথে যেন পা বেঁধে গিয়ে রাস্তার মধ্যে আছড়ে পড়লো সে। উঠতে যাবে হঠাৎ যেন কেউ পেছনে থেকে ডাকলো ওকে,

- আমিনা!

ভয়ে আতঙ্কে জমে গেলো আমিন। উঠার শক্তি যেন হারিয়ে গেলো কোথায়।

- কেও?

মাটিতে পড়ে থেকেই ভয়ে ভয়ে জিঞ্জ্ঞাস করলো সে।

- চিনবার পারসনাই?

- ব... বশির ভাই তুমি?

খানিকটা সময় আর কোন উত্তর আসেনা। ভয়ে চোখ বন্ধ করে মাটিতেই পড়ে থাকে আমিন। বৃষ্টির ঢলে ভিজে একাকার। ঠাণ্ডায় আতঙ্কে ঠক ঠক করে কাপতে থাকে সে।

- হ! আমারে মিছা ডর খাওয়াইয়া মারলি কেন আমিনা?

একটু পরেই আবার স্বরটা ভেসে আসে। এবার যেন খুব কাছ থেকে। ঠিক যেন আমিনের পাশে এসে বসেছে কেউ।

চিৎকার করে উঠে আমিন। প্রচণ্ড গতিতে বৃষ্টি সাথে সাথে ভেসে এলো দমকা হাওয়া। শো শো বাতাসের শব্দে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো তার কণ্ঠস্বর! সেই বিকট শব্দ ভেদ করে করে যদি কারো শোনার ক্ষমতা থাকতো তাহলে শুনতে পেতো আমিন চিৎকার করে বলছে,

- বিশ্বাস করো বশির ভাই, আমি মজার করবার নিছিলাম... আমি ইচ্ছা করে করিনাই!

গল্পগুলো হারিয়ে যায়



ঘরটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা ছিল। নাহ! ভুল বললাম বোধহয়! একপাশের কোণে প্রায় নিভু নিভু একটা হারিকেন জ্বলছিল, গুরুতে ঠিক চোখে পড়েনি। ঘরটার ডান কোণে একটা টেবিল, জমানো বইয়ের স্তুপ আর একগাদা কাগজের ভিড়ে খুব শান্ত হয়ে বসে আছেন একজন লোক। লোকটার চোখ বন্ধ করা। অন্ধকারে, হারিকেনের নিভু নিভু আলোয় অবশ্য ঠিক ভালো করে বুঝা যায়না। তবু, কেন যেন মনে হলো কোন এক অভিমানে কিংবা ক্রোধে আবার কে জানে, হয়তো হতশায় চোখ বন্ধ করে রেখেছেন তিনি।

আমি বেশ খানিকখন ঠায় দাড়িয়ে রইলাম। লোকটাকে ঠিক ডাকব কীনা বুঝতে পারছিলাম। এই সময়ে ডাকাটা কি উচিত হবে? ভাবলাম।

আবার না ডেকেও তো কোন উপায় দেখছিলাম। এই লোকটার সাথে আমার কথা বলা খুব দরকার। আমি আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

সাহস করে ডাকলাম, শুনছেন?

– কি চাই?

বাজখাই গলায় খানিকটা যদিও চেচিয়েই বললেন লোকটা। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু প্রশ্নের রেশ পেলাম।

- একটু বসতে পারি? আপনার সাথে কিছু কথা বলার ছিল।

কথাগুলো বলে উত্তরের জন্য অপেক্ষায় রইলাম। বেশ খানিকটা সময় চলে গেল, ওদিক থেকে কোন উত্তর পেলাম না। ঘোঁত! করে গলায় শব্দ করলেন একবার কেবল। বোধহয় খুব কঠিন কিছু বলতে গিয়ে শেষমেষ নিজেকে থামিয়ে নিলেন। খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেলাম। কি করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। শেষমেষ খানিকটা কাচুমাচু করেই বসে পড়লাম।

- কি জন্য এসেছেন?

চোখ খুললেননা, একটুও নড়াচড়া করলেননা। প্রশ্ন করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমার ধারণা তিনি উত্তরের জন্য অপেক্ষায় নেই। কারণ আমার ধারণা কি জন্য এসেছি সেটা তিনি ইতোমধ্যেই জানেন। বসতে পেয়ে কিছুটা যেন স্বস্তিবোধ করলাম।

- আমি কেন এসেছি আপনি জানেন না?

এবার একটু জোর দিয়েই বললাম। উত্তর এলো সঙ্গে সঙ্গেই,

- জানি!

চমকে উঠলাম। আমার পুরোপুরি ধারণা ছিল, তিনি অস্বীকার করবেন। অবশ্য স্বীকার করতে আমার লাভই হলো। ভরসা পেলাম। উদগ্রীব হয়ে বললাম, জানেন যখন আমাদের একটু সাহায্য করুন!

- কিভাবে?

- আমাদের মুক্ত করুন। একের পর এক তৈরি হয়ে আমরা সব ঘোঁট পাকিয়ে উঠছি! আমাদের প্রকাশ করুন, মানুষের কাছে পৌঁছে দিন।

অনুরোধ করলাম। খানিকটা যেন আশার সঞ্চারও হলো। উত্তরের জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম। সেইসাথে কোথায় যেন একটু লোভও হলো। মুক্তির আশা! কি বলবেন ওনি? অবশেষ কি শুনব সেই কথাটা? যেটার জন্য এতোদিন অপেক্ষায় থাকা?

- পারবোনা!

নির্লিপ্ত উত্তর এলো। এতো দ্রুত, এতো অবলীলায় তিনি আমার স্বপ্নটাকে নাকোচ করে দিলেন যে আমি চমকে উঠার সময়টুকুও পেলাম না। কিছুটা সময় পেরোল। চুপচাপ। কেউ কোন কোন কথা বললাম না। কথাটা আমি শুনেছিলাম শুধু, এবার যেন বুঝতে শুরু করলাম। ওনার নির্লিপ্ত “পারবোনা!”-র মানে আমার কাছে কতটা ভয়াবহ! কতটা দুঃসহ!

দিনের পর দিন মুক্তির আশা লালন করে একটা বাক্যের পাঁকে বারবার মিলিয়েই কি যাব শুধু?

ভয় আমার কেটে গিয়েছিল অনেক আগেই। এবার ক্রোধ হলো। অভিমানতো ছিলই। তাই কখনও যা করিনি, এবার তাই করলাম।

– কেন নয়? আমাদের কি দোষ?

গলার স্বর উচু করে বললাম আমি। বলতে গেলে খানিকটা চোঁচিয়েই। লোকটার চোখ এতোখন বন্ধই ছিল। এতো কথার মাঝেও তেমনি অনড় হয়েই বসেছিলেন। এবার যেন একটু গায়ে লাগল তাঁর। ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। চোখও খুললেন। ঠান্ডা চাহনি, সেখানে ক্রোধ ঘৃণা অভিমান মিলে এক অদ্ভুত শীতলতা। সবকিছু যেন বহুদিন ধরে জমে আছে, যেকোন সময় উগড়ে পড়তে চাইছে কিন্তু আবার যেন নিশ্চল হয়ে থাকছে। আমার ভয়টা আবার ফিরে এলো। ক্রোধ মিলিয়ে গেছে অনেক আগেই। হঠাৎ অমন করে চোঁচানোর জন্য অনুতাপও যেন লাগলো কিছুটা।

– সত্যিই জানতে চান?

অদ্ভুত ঠান্ডা একটা কণ্ঠস্বর। কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কি বলব, ভেবে পেলাম না। চুপ করে রইলাম?

– বলছি, শুন্য সাহস আছে?

এবার ঠিক উলটো ঘটলো। জমানো সেই ক্রোধ ঘৃণা অভিমান এবার যেন ফেটে পড়লো। আমি জমে গেলাম।

– বাজারে তো তোমাদের কেউ খাচ্ছেনা আর? দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরে তোমাদের যে লেখব সে কাগজের পয়সা কে দিবে? কেউ কিনবে তোমাদের?

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। লোকটা ক্রোধে স্বরে কথা বলছেন, কিন্তু তাঁর ক্রোধ আমার চোখে পড়ছেন। আমি দেখছি তাঁর চোখ। সব আক্রোশ, ঘৃণার আড়ালে যে একরাশ অভিমান জমে আছে সেটা কার প্রতি? আমাদের?

আমি একটি গল্প, আমি ফিরে যাচ্ছি। আমার পিছু পিছু আমার সকল চরিত্ররা। আমাদের যিনি ভাবছেন, তিনি আমাদের নিয়ে আর লিখবেন না। তাহলে কি আমরা হারিয়ে যাব?

কেউ আলোয় আসে



বন্ধু জাফরকে দেখলাম ভয়াবহ রকমের কাঁপছে।

বললাম, এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বস। তারপর না হয় শুনা যাবে কি হয়েছে।

চায়ের দোকানে একটা বেঞ্চিতে হাত ধরে নিয়ে বসলাম ওকে। দুজনে প্রায় নীরবেই বলতে গেলে দুকাপ চা শেষ করলাম। এই সময়ে নিজেকে অনেকটাই গুছিয়ে নিলো সে। হাত পায়ের কাপাকাপি কমে গেছে। ওর চোখ সোজা রাস্তায়। অনুসরণ করে তাকলাম আমিও। দেখলাম রাস্তা পাড় হতেগিয়ে একটা তেলাপোকা গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। একটু পরেই আরেকটা গাড়ি এসে সেটাকে একেবারে খেঁৎলে দিয়ে চলে গেল। খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু অধিকাংশ সময় এগুলো চোখ এড়িয়ে যায়। তেলাপোকা হোক, আর আশেপাশে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা চোখ এড়িয়েই যাওয়া হোক, ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

চোখ ঘুরিয়ে জাফরের দিকে তাকলাম। ওর দৃষ্টি তখনও রাস্তায়ই পড়ে আছে।

“কারেন্ট ছিলনা বুঝলি? অন্ধকারে একটা চিৎকার...”

প্রায় ফিস ফিস করেই বলতে গেলে কথা শুরু করলো সে। আমি অবশ্য বাধা দিলাম। মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

“গোঁড়া থেকে খুলে বল। কোথায় কারেন্ট ছিলনা? কখন ছিলনা?”

জাফর খানিকটা সময় চুপ করে রইলো। রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে সামনের গাছটার পাতার আড়াল দিয়ে বোধহয় আকাশের দিকেই তাকালো। কথাগুলো গুছিয়ে নেওয়া হতেই আবার বলা শুরু করলো সে,

“আমি গিয়েছিলাম আমার এক আত্মীয়ের বিয়ের দাওয়াত খেতে। ঢাকার আশেপাশেই একটা জায়গায়। বিয়ের আয়োজন ছিল একটা কমিউনিটি সেন্টারে। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে পড়লামে এক আজব ফ্যাসাদে। কি এক অজ্ঞাত কারণে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকা নিষেধ করে দিলো সবাইকে। অদ্ভুত ব্যাপার আগে দেখিনি। কিন্তু সেজে গুজে গেছি, দাওয়ার না খেয়েতো আর ফেরা যায়না। তাই আর সকলের মতো আমিও সেলফোনটা বাইরে একটা জায়গায় জমা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। আর পাঁচটা বিয়ের মতোই নাচগান হৈ হুল্লোড় চলতে থাকলো। কিন্তু বিপত্তিটা ঘটলো একটু পরে। হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেলো!”

“তারপর অন্ধকার সেই চিংকারটা শুনতে পেলি?”

“নাহ! কে একজন যেন চৈঁচিয়ে বলে গেলো জেনারেটরের কি যেন একটা সমস্যা! ঠিক হতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে।”

“ওহ্!”

“একদিকে কারেন্ট চলে যাওয়ায় সব আলো চলে গেছে। তার উপর আবার কারো কাছেই সেলফোনও নেই যে একটু আলো জ্বালবে। একটা অদ্ভুত বিকট অন্ধকার নেমে এলো পুরো হলটা জুড়ে। হৈ হুল্লোড় থেমে গেছে ইতোমধ্যেই। কেউ কেউ অবশ্য নিচু গলায় একে অপরের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে থাকলো। ওখানে আমার তেমন কেউ পরিচিত ছিলনা, তাই সরে গিয়ে একটা কোনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকারটাও ধীরে ধীরে চোখে সয়ে আসতে লাগলো। ছায়া ছায়া মানুষের অবয়ব চোখে পড়ছে এখন। ঠিক তখনই একটা চিংকার কানে এলো...। একটা মেয়ের গলা। ভয়াবহ চিংকারটা মুহূর্ততেই পুরো হলটাকে হিম করে দিলো যেন। কিছু বুঝে উঠার আগেই বাইরে জেনারেটরের একটা মৃদু গুঞ্জন শুনা গেল আর তারপরেই দপ করে জ্বলে উঠলো আলোগুলো। দেখলাম...”

এই পর্যায়ে এসে জাফর চুপ করে গেল। চোখদুটো কেমন যেন ছলছল করে উঠলো। এতক্ষণের স্থিরতা যেন হঠাৎ-ই কোথায় মিলিয়ে গেলো। হাত পা আবার আগের মতোই কাপতে শুরু করল। আমি অবশ্য ততক্ষণে কৌতূহলে নিজের স্বাভাবিক জ্ঞান খুইয়ে বসে

আছি। তাই আর ওকে ধাতস্থ করতে গিয়ে সময় নষ্ট করলাম না। খুব দ্রুত বার কয়েকবার জিঞ্জের করলাম,

“কি দেখলি তারপর? দেখলিটা কি?”

জাফর এবার মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। তারপর মাথাটা নুইয়ে বেঞ্চে আমার আর ওর বসার মাঝখানের ফাকা জায়গাটাতে কাঁপা কাঁপা হাতে আঙুল চালিয়ে আঁকিবুঁকি টানতে টানতে বললো,

দেখলাম একটা মেয়ে, আমার থেকে হাত তিনেক সামনে দাঁড়ানো। হ্যাঁচকা টানে কে যেন তাঁর বুকের কাপড়টা ছিঁড়ে নিয়েছে। প্রায় উন্মুক্ত হয়ে মেয়েটার ডান স্তনে একটা ভয়াবহ নখের আচরের দাগ!

আগেরবার মেয়েটা বোধহয় ব্যথায় চঁচিয়েছিল। আলো ফিরতে কম করে হলেও প্রায় কুড়ি জোড়া চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তাঁর উপর। এবার দ্বিগুণ শব্দে লজ্জায় চিৎকার করে মেঝেতে এলিয়ে পড়লো সে। তাঁকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যেই একটা জটলা তৈরি হয়ে গেলো। আমিও এগিয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যেই দেখতে পেলাম মহিলারা এসে ইতোমধ্যেই আগলে ধরেছে মেয়েটাকে। কারো একজনের চাদর দিয়ে শরীরটাও ঢেকে দেওয়া হওয়া তাঁর। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন চেনা আত্মীয় স্বজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেড়িয়ে গেলেন।

একটানা কথাগুলো বলে জাফর থামলো।

“যৌন হেনস্থা। বুঝাই যাচ্ছে, অনুষ্ঠানে আগতদের মধ্যে বিকৃতমনা কেউ সুযোগ পেয়ে ঘটনাটা ঘটিয়েছে। যাহোক, আজকাল তো এগুলো প্রায় নিত্যকার ব্যাপার হয়ে গেছে। রাস্তা, ঘাটে চলতে ফিরতে এমন কত ঘটনা দেখি! তুই আগে কখনও দেখিসনি?”

“দেখেছি। কিন্তু সেগুলো একটু পরেই ভুলে গেছি। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা অন্য!”

“অন্য?”

“হ্যাঁ!” ঘটনাটার পর থেকেই আমি একটা একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি।

“কি রকম? মানুষিক? ট্রমা?”

“অনেকটা ওরকমই।”

“খুলে বল।”

“মেয়েটাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে একবার ফিরে আমার দিকে তাকিয়েছিল। সেই সময় আমার মনে হলো মেয়েটার চেহারা ঠিক টুম্পার মতো!”

“টুম্পার মতো? টুম্পাটা আবার কে?”

জাফর অপরাধীর ভঙ্গিতে একবার আমার দিকে তাকালো। দেখলাম ওর চোখ ছিল ছিল করছে। দিনের আলো অনেকটাই কমে এসেছে এতক্ষণে। চায়ের দোকানে জ্বালানো আলো গিয়ে পড়েছে ওর চোখে। অদ্ভুত রকম দেখাচ্ছে এখন ওকে। মনে হচ্ছে কয়েকটা খুন করে এসে যেন স্বীকারোক্তি দিচ্ছে কেউ।

“আমাদের এলাকায় থাকতো!” আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, তখন সে পড়তো ক্লাস সেভেনে। আমার বড় ভাইয়ের কাছে একসাথেই পড়তে বসতাম দুজন। একদিন ভাই যেন কোথায় বেড়িয়েছিল। টুম্পা আর আমি একা একাই বসে পড়ছিলাম। এমন সময় কারেন্ট চলে গেল। আমি সেই সুযোগে...

“বুঝেছি! আর বলা লাগবেনা!”

“ঠিক এইভাবেই চেষ্টায়ে উঠেছিল সে...”

“ছি! তুইও দেখি তাদের দলেই পড়িস। তুই আমার বন্ধু এটা ভাবতেই এখন লজ্জা লাগছে আমার!”

তীব্র ক্রোধে কথাগুলো বললাম ওকে। প্রচণ্ড একটা আক্রোশ আর ঘৃণা ঘিরে ধরলো আমার। জাফর বোধহয় বুঝতে পারলো আমার মনোভাব। সে মাথা নুইয়ে আগের মতোই টেবিলে আঁকিঝুঁকি টানতে লাগলো। ওর দিকে আর তাকাতেই ইচ্ছে করছেনা আমার। মনে হলো জঘন্য লোকটার গায়ে থুথু ছিটিয়ে দেই। কিন্তু শেষ অবধি সামলে নিলাম নিজেকে। কিছুটা সংযত স্বরেই বললাম,

“তুই আর আমার বন্ধু থাকার যোগ্যই নস। আজকের পর থেকে আর আমার সাথে কোনরকম যোগাযোগ করবিনা।”

জাফর মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। প্রথমে ওর চেহারায় আগের সেই অপরাধী ভাবটা থাকলেও ক্রমেই দেখলাম সেটা মিলিয়ে গিয়ে একটা বিস্ময়ে হতবাক হওয়ায় পরিণত হলো। ভালো করে খেয়াল করতে দেখলাম ঠিক বিস্ময় যেন নয়, কিসের একটা ভয় চিকচিক করছে ওর চোখে।

আমি বললাম, উঠি।

“এক মিনিট!”

খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল সে। কেমন যেন ভড়কে দেয়ার মতো শুনালো গলার আওয়াজটা। কি যেন একটা বলতে গিয়েও থতমত খেয়ে গেলাম আমি। তাই পালটে বললাম,

“কি! এক মিনিটের সময় নেই! তোর সাথে আর কোন কথা নেই আমার!”

“আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি!”

জাফর তেমনি অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো।

“পাগল?”

“হ্যাঁ! তখন ওই মেয়ের মুখে টুম্পার চেহারা দেখেছিলাম, এখন কি দেখতে পাচ্ছি জানিস?”

“কি?”

“তোর মুখে আমার চেহারা!”

“কি বলছিস যা...তা!”

জাফরের কথায় ঢোক গিলে বললাম আমি। একটু অদ্ভুত রকম ভয়ের অনুভূতি হলো কেমন যেন। মনে মনে নিজেকে সাহস দিতে ভাবলাম, যত যাই হোক আমার কথা আমি কাওকে বলবনা। অন্ধকার ছেড়ে আলোতে আমি কিছুতেই আসবনা।

কাকের শিল্পবোধ



সুন্দর একটা ফুল ফুটেছিল। তাই দেখে কোথেকে যেন একটা প্রজাপতি উড়ে এলো। বাহারি রং করা তার ডানা ফুলটাকে যেন আরো সুন্দর করে তুললো। ফুলগাছটার ঠিক পাশেই ছিল একটা বড় আম গাছ। সেই আম গাছের ঢালে বসে ঢুলছিল একটা কাক। সে হঠাৎ কা... কা... করে উঠলো।

প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলো, ও কাক ভাই, কি হয়েছে? অমন টেঁচাচ্ছ কেন?

কাক উত্তর দেয়, কি বিচ্ছিরি ফুলটা, আর কি বিচ্ছিরি তোর গায়ের রঙ। আমরা চোখ খানাইতো নষ্ট করে দিলি।

“সেকি! সবাই তো বলে আমার ডানা খুব সুন্দর।”

“সেতো শিল্পবোধের আকাল পড়েছে কিনা তাই।”

“তাহলে তুমি বলছো তোমার খুব শিল্পবোধ আছে?”

“আলবৎ আছে। শিল্পবোধ না থাকলে আমি শিল্পী হই কি করে?”

“তুমি যে শিল্পী এইটা তুমি বুঝলে কি করে? কেউ কি তোমাকে বলেছে?”

“সরাসরি বলেনি। তবে আমি বুঝে নিয়েছি।”

“কিরকম?”

“শিল্পীদের রুচি ঠিক আর সবার মতো হয়না। তাদের রুচি হয় ভিন্ন। তাদের আর সবার ভালো লাগেই বলে ফুল ভালো লাগেনা, তাদের আর সবার ভালো লাগে বলেই প্রজাপতি ভালো লাগেনা। এছাড়া আরও কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমার সাথে খুব যায়!”

“যেমন?”

“যেমন ধর, খামখেয়ালিপনা। হঠাৎ হঠাৎ উদাস হয়ে যাওয়া। কাজের কাজ ফেলে রেখে খামোখাই ঢুল খাওয়া। মানুষ হলে অবশ্য সিগারেটটাও মেডাটরি ছিল। কিন্তু কাকের হাত নেই বলে সেটা বাদ।”

সব শুনে প্রজাপতি মুখে বলে, আচ্ছা। মনে মনে ভাবে, কাকটা কি পাগল হয়ে গেলো?

কাকটা যেন প্রজাপতির মনের কথা বুঝতে পারে। সে বলে, পাগলের মতো কাণ্ড কারখানা করাও কিন্তু শিল্পীর আচরণের মধ্যে পড়ে।

প্রজাপতি চুপ করে কি যেন একটা ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা! তুমি যে একটা শিল্পীর সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসে আছে, তা কোন শিল্প কি তৈরি করতে পেরেছো?

“না। আমার এই ছোট জীবনে একটা কাক-রাগীয় সংগীত বাদে আর তেমন কোন কিছুই তৈরি করিনি। তবে আমি চাইলেই পারি। চাইলেই গান বাদতে পারি যেটা কাকেন্দ্রনাথকে হার মানাতে পারে, চাইলেই কবিতা লিখতে পারি যেটা কাকানন্দকে হার মানাতে পারে।”

“তবে লেখোনা কেন?”

“লিখব। লিখব একটু সময় হোক! কাকবেল নামক পুরস্কার একটা আমার নামে লেখাই আছে বুঝলে? অবশ্য তুমি আর বুঝবে কি! তোমার নিজের ডানার ডিজাইনটাই তো বিচ্ছিরি! শিল্পের ছোয়া নেই বলতে!”

কাকের কথা শুনে প্রজাপতি দুঃখ পায়, ফুলটা মুষরে পড়ে। কিন্তু কেউ কোন রা করেনা। ভাবে, সবাইতো আর এক নয়। কারো কারো কাছে ফুল কিংবা প্রজাপতির পাখা সুন্দর না ই লাগতে পারে। দিন যায়, মাস যায়। ফুলটা ঝড়ে পড়ে, ফুল গাছটাও বিলীন হয়ে যায়। প্রজাপতিটাকেও আজকাল আর চোখে পড়েনা। অবশ্য সেই আমগাছটার ঢালে বসে কাকটা এখনও দিব্বি ঢুল খায়। মাঝে মাঝে আনমনে কা... কা করে তার কাক-রাগীয় সঙ্গীত চর্চাও করে।

আমগাছটার পাশেই ছিল একটা প্রকাণ্ড মাঠ। বছরে একবার ধান হয়, বাকি সময়টা খালিই পড়ে থাকে। খালি মাঠের বুক চিড়ে এক সময় গজিয়ে উঠে নরম নরম কচি কচি

সবুজ সবুজ ঘাস। কৃষকেরা তাদের গরু ছাগল চড়িয়ে দিয়ে যায় সেখানে। দুপুর অবধি মনের আনন্দে ঘাস খায় তারা। তারপর বিকেল অবধি বসে বসে জাবর কাটে। সন্ধ্যা হতে না হতেই বাড়ি ফেরার জন্য চেষ্টামেচি শুরু করে দেয়। গরু ডাকে, হাঙ্গা... হাঙ্গা...। ছাগল বলে, ম্যা... কিংবা... ব্যা...।

সেই আমগাছে বসে কাকটা শুনে। তার মন জুড়িয়ে যায়। ভাবে আহা, এতো মধুর গান কে গায়? একবার তো দেখে আসা উচিত।

একদিন দুপুরে কাক হাজির হয়ে যায় সে মাঠে। উড়ে গিয়ে বসে একটা গরুর পিঠে। গরু তখন আনমনে জীবন সংসার নিয়ে গভীর চিন্তা করতে করতে জাবর কাটছিল। কাকের আগমন সে টেরই পেলোনা।

কাক খানিকটা লাফালাফি দাপাদাপি করেও গরুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলোনা। শেষে ডাকলো, কা... কা... ও গরু ভাই।

গরু বলে, হাঙ্গা... কে রে তুই? অদৃশ্য থেকে কথা বলিস কেন?

“আমি অদৃশ্য না গরু ভাই। আমি তোমার পিঠে বসে।”

“ও আচ্ছা। তাই তো বলি হঠাৎ পিঠটা এতো চুলকাচ্ছে কেন!”

কাক এসেছিলো গরুর সাথে সঙ্গীত নিয়ে কথা বলতে। কিন্তু গরু তাকে চুলকানির কারণ বানিয়ে দেয়ায় সে যেন একটু অপমানবোধ করে। খানিকটা সময় গরুর পিঠেই তেমনি বসে থাকে। উদাস হয়ে কি যেন ভাবে। তারপর কাক রাগীয় সুরে একটা বেদনা বিধুর সুরে গান ধরে, কা... কা...কা কা কা...কা...।

শুনে গরু বলে, হাঙ্গা হাঙ্গা। লা জওয়াব।

ছাগল বলে, ব্যা... চমৎকার!

কাক আনন্দে নেচে উঠে। ভাবে, এতোদিনে শিল্প চর্চার আসল মানুষ পাওয়া গেলো। সেই সন্ধ্যায় কাকের কা... কা..., গরুর হাঙ্গা... ছাগলের ব্যা ব্যা তে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠলো।

মাঠ বেড়িয়ে জঙ্গল, সেখানে একটা পাতার ফাকে কান চেপে বসেছিল সেই প্রজাপতিটা। কান চাপা অবস্থায়ও সে শুনতে পেলো গাছের উপর থেকে একটা বাদর বলছে, আহা! কি গাইছে। আমাদের দেশে এসব চলেনা বলে বেচারারা দাম পেলনা।

ইস্টপেন্‌ট্রা



ঘরে ঢুকে দেখি ব্যাটা এখনও যায়নি।

সেই সকাল আটটায় যেমন দেখে গেছি, এখনও দেখছি তেমনি সোফায় পাটকাঠির মত পা গুলো ঝুলিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে হ্রমূর করে উঠতে গিয়ে পড়লো উল্টে!

ব্যাপারটা দেখে ভয়ানক হাসি পেলেও আমি কোনমতে মুখটা সিরিয়াস করে রাখলাম। মনে মনে একটা ধমক লাগাব কিনা ভাবলাম। ব্যাটা বড় জ্বালাতন শুরু করেছে।

ঘটনার শুরু গতকাল সন্ধ্যায়। গলি রাস্তা ধরে বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ করে মনে হল কে যেন পেছন পেছন আসছে। থেমে দাড়িয়ে পেছনে তাকাতে দেখি কি যেন একটা অদ্ভুত একটা প্রাণী আমার ঠিক দু ফিট দূরে হাসি হাসি মুখ করে দাড়িয়ে আছে।

লাইট ফেলতেই চমকে উঠলাম। বিরাটাকার মাথা, লম্বা নাক আর সে নাকের উপরে প্রায় ঝুলে থাকা এক জোড়া চোখ। হাড় হিরহিরে কালো কুচকুচে শরীর, আর মস্ত একটা মুখ হা করে মায়াবী বানাতে গিয়ে বরং আর বিদঘুটে করে তুলেছে। প্রথমে একটু ভয় ভয় লাগলেও, প্রাণীটার স্বাস্থ্য গতর দেখে বেশ নিরিহই মনে হলো—

তাই বেশ একটু তাতিয়ে হেঁড়ে গলায় বললাম,

“কেরে ব্যাটা ভুই?”

প্রাণীটা মনে হলো বেশ একটু বিব্রত হল। একটু দুঃখিতও। ওকে না চিনতে পাড়ায় যেন ব্যাচারা ভয়ানক অপমানিত বোধ করছে। তারপর একটু কেশে উত্তর দিল,

“আমি একটা এলিয়েন! আমার নাম ইস্টপেন্ট্রাকাসটুকস!”

“ইস্টপেট...”

উচ্চারণ করতে গিয়ে বুঝলাম অমন নাম উচ্চারণ করা আমার কন্ম নয়। সুতরাং এলিয়েন বলে স্ববোধন করাটাই যুক্তি সঙ্গত মনে করলাম।

“তা এলিয়েন সাহেব, আমার পেছন পেছন আসছেন কেন আপনি?”

বেচারাকে মনে হলো আবারো বিব্রত করে দিলাম। কিন্তু এবার কি কারণে বিব্রত হল ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এলিয়েনটা গাইগুই করে দু তিনবার কি বলতে গিয়ে যেন থেমে গেল।

তারপর দেখি কাঁধে ঝুলানো মস্ত একটা ব্যাগ থেকে খাতা কলম বের করছে। ব্যাগটা ওর শরীরের কমপক্ষে দুই গুন তো হবেই। মাটিতে লেগে ময়লায় একসার হয়ে আছে। এরই মধ্যে ব্যাগ থেকে বের করা খাতার কগজে কি যেন একটা লিখল বেশ মনযোগ দিয়ে। তাঁরপর বেশ কয়েকবার নিজে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল সেটা।

তারপর খানিকটা দূরে সরে গিয়ে হাসি হাসি মুখ করে দাড়িয়ে রইল।

পুরো ব্যাপারটার আকস্মিকতায় আমি তখন প্রায় বিমূঢ়! আর না হয়েই বা কি করব। এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখব কেউ ভেবেছেকি কখনও!

গল্পে, সিনেমায় অনেক যেসব এলিয়েনের কথা শুনেছি। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব ডিভাইস ইউস করে বলে জানতাম। কিন্তু কোন এলিয়েন কে কাগজে কলম চালাতে এই প্রথম দেখলাম।

যাহোক আমি লাইট জেলে কি লিখেছে সেটা পড়ায় মনযোগ দিলাম।

এক গাদা কাটাকুটি আর ভুল বানানে ব্যাটা যা লিখেছে তা হচ্ছে, ও ওর কয়েকজন বন্ধুর সাথে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে। তো দোকান থেকে এলিয়েন নিয়ে লেখা একটা গল্প পড়ে ওর বড্ড ইচ্ছা যে ওকে নিয়েও কেউ অমন একটা গল্প লিখুক।

আমি একবার চোখ তোলে তাকালাম। বেচারার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ আশা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। কিন্তু আমার বেচারাকে নিরাশই করতে হল। একে, আমি তেমন খাঁচের কোন লেখক নই। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের জন্য মা, দাদীদের কাছ থেকে ধার করা গল্প নিয়ে দু একটা রূপকথা লিখি। আর সবচেয়ে বড় কথা এলিয়েন কে নিয়ে রূপকথা লেখা যায়না,

লিখতে হয় সায়েন্স ফিকশন। সায়েন্সের বড় বড় টার্মগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম, আজকাল এক চিলতে ক্লাস টু এর বাচ্চার বৈজ্ঞানিক যুক্তি পর্যন্ত আমার মাথার উপর দিয়ে সো...সো করে চলে যায়।

আমি বললাম,

“এলিয়েন সাহেব, আমি তো সায়েন্স ফিকশন লিখতে জানিনা। আপনি বরং অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করুন। এই যে দেখুন, আপনি ইস্টু ফিস্টু কি যেন একটা নাম বললেন আপনার নাম আমি উচ্চারণই করতে পারলাম না!”

বেচারি এলিয়েনের হতাশ মুখটা দেখার ইচ্ছা হলোনা আমার। তাই দ্রুত ওর হাতে কাগজ খানা গুজে দিয়ে হাটা ধরলাম। খানিকটা পথ ভ্রমতা কিংবা নিজের সাহস জারি করার ইচ্ছা যে কারণেই হোক ঢিমে তালে হাটলেও, শেষমেষ যখন বাড়িতে পৌঁছলাম তখন দৌড়াতে দৌড়াতে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ।

কোন রকমে খাবার দাবার সেরে নিয়ে দরজা জানালা ভালো করে আটকে যখন বিছানায় কাঁথার নিচে সেধোলাম তখনও আবার বুক ধরফর একটুও কমেনি।

পরদিন সকালবেলা সবকিছু ঠিকঠাক দেখে কিছুটা শান্ত হলো মন। এলিয়েন ব্যাটা নিশ্চয় তার গ্রহে গোষ্ঠি সমেত ফিরে গেছে। প্রাতঃক্রিয়া সেরে বেশ ফুরফুরে মনেই অফিসের পথে রওয়ানা দিলাম। গলির মুখে ভিখারি বসে প্রতিদিন, রোজ আমি যাওয়ার সময় তাঁর মায়বী সুরে ভিক্ষা চাওয়া অবহেলা করে অনায়াসে পেরিয়ে যাই। আজকে কি মনে করে তাক পুরো একটা দশ টাকা নোট দান করে দিলাম।

কিন্তু তখনও কি জানতাম যে, অমন সহজ সরল মুখের নিরিহ এলিয়েনটা আঠার মত সেটে গিয়ে আমার জীবনটা দুর্বিষহ করে তুলবে!

সেদিন সারা দিন খাটা খাটুনি কম যায়নি। সুতরাং বাসায় এসে বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শোতে না শোতেই একরাশ ঘুম ঝেকে ধরলো আমাকে।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি কি যেন পেটের উপর বসে বিড়বিড় করে কি যেন আওড়াচ্ছে। ঘর অন্ধকার ছিল। তাও বুঝতে দেড়ি হলোনা কে এটা,

ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় মেজাজটাই বিগরে গিয়েছিল। ধমক লাগলাম,

“কিরে ইস্টু পিস্টু, হতচ্ছাড়া আবার কি চাস?”

বলতে না বলতেই ব্যাটা আরেকটা কাগজ এগিয়ে দিল আমার দিক। আমি লাইট জ্বালালাম। অবশ্য তার আগে ঝারি দিয়ে পাজিটাকে পেটের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম।

বেচারা সারা ঘর খোঁজে ওর সাইজে জুত করে বসার মত কিছু না পেয়ে শেষ মেস অনেক কসরত করে গিয়ে সোফার উপর উঠে বসলো।

আমি কাগজে চোখ বুলালাম। এবার ব্যাটা ইংরেজিতে বড় করে প্লিজ লিখে এনেছে। তাতে আবার পি লিখতে গিয়ে বি লিখে ফেলেছে। আমি রাগী রাগী চোখে এলিয়েনটার দিকে তাকালাম। বললাম,

“আমাকে প্লিজ কি হাতুরি দিয়ে পিটলেও সায়েন্স ফিকশন বেরোবে না। সুতরাং অন্য জায়গায় তদবির করলে অনেক দ্রুত কাজ হয়ে যাবে!”

কথাটাতে এমন ম্যাজিকের মত কাজ হবে ভাবিনি। আমার কথা শেষ হতে না হতেই হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বেড়িয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বোধ হয় গালাগালিই করে গেল। বেচারা মনে হয় এবার সত্যিই আমার উপর হতাশ হয়ে পড়ল। কোন লেখার জন্য কেউ আমার কাছে এতোকরে কখনও তদবির করেনি কখনও। তাই মানুষ না হোক, এলিয়েনের কাছ থেকে হলেও খানিকটা আদর আবদার আমারও খারাপ লাগছিলোনা। বেচারী এভাবে এক কথায় চলে যেতে দেখে কষ্টই লাগছিলো তখন। কিন্তু আপদ চুকল ভেবে পরোক্ষনেই আবার মনে সন্তি ফিরে পেলাম।

কিন্তু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তো আমার চোখ চড়ক গাছ! ব্যাটা দিব্বি সোফায় পা তুলে বসে। এবার যেন খানিকটা গম্ভীর করে রেখেছে মুখটা। হাবভাব দেখে মনে হলো সোজা আস্তুলে ঘি না উঠায় এবার যেন বাঁকা আস্তুলের কোন কৌশল বাতলে এসেছে। মনে মনে কিছুটা দুঃশ্চিন্তা কাজ করলেও, সামলে নিলাম। একেতো দিন, ভয় দেখিয়ে কিছু করতে পারবে না, তাঁর উপর ব্যাটার যা লিকলিকে হাত পা, আমাকে তেড়ে মারতে আসলে উলটা নিজেই আছরে পরে হাত পা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কোন আজব যন্ত্রর মন্তরও যে তাঁর দখলে নাই সেটাতো আগেই জেনে গিয়েছিলাম।

তাই ওরকম হাবভাবকে আমিও তেমন পান্ডা দিলাম না। যেন দেখতেই পাইনি এমন ভাব করে সোজা রেডী হয়ে অফিসে চলে গেলাম।

অফিস ফেরত বাড়ি ফিরেও দেখি ব্যাটার যখন কোন নড়াচড়ার লক্ষণ দেখলাম না, তখন এক রকম বাধ্য হয়েই বললাম,

আন দেখি তোর খাতা!

লাফাতে লাফাতে ব্যাটা তৎক্ষণাৎ তার ব্যাগ থেকে বের করে আনলো সেই খাতা আর কলম।

আমি লিখতে বসলাম। জিঞ্জেস করলাম,
ইস্টুপেন্ট্রাকে দেখলাম গম্ভীর মুখ করে বসে আছে। নতুন নামে খুশি হলো কিনা বুঝা
গেলনা।

“তা, ইস্টুপেন্ট্রা! তোর গ্রহের নাম কি?”

ইস্টুপেন্ট্রা এবার এমন একটা শক্ত নাম বলল যে, আমি লেখা তো দূরের কথা
দ্বিতীয়বার ভাবারও চিন্তা করলাম না।

বললাম, কোন এডভেঞ্চার হয়েছে পৃথিবীতে এসে?

উত্তরে ও আমাকে একটা গোবরে পোকাকার সাথে যে যুদ্ধের কাহিনী বলল, তাতে বুঝলাম
ওর এডভেঞ্চারের দৌড় কতদূর!

শেষ মেশ নিজেই একটা রূপকথা টাইপ গল্প লিখে দিলাম ওকে নিয়ে। মহা উৎসাহ
নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেড়িয়ে গেল ইস্টুপেন্ট্রা। যাবার আগে অবশ্য ধন্যবাদ দিতে
ভুললোনা।

এর পরে আর বেশ কয়েকদিন ইস্টুপেন্ট্রার কোন সাক্ষাৎ পেলাম না। ভাবলাম দলবল
সমেৎ পৃথিবী ছেড়ে ভেগেছে মনে হয়। প্রায় ভুল গেছি, এমন সময় একদিন এসে হাজির।
হাতে একটা বুরি। তেমনি সোফায় পা বুলিয়ে বসে আছে। আমি দেখে খুশিই হলাম,
বললাম, কিরে ইস্টুপেন্ট্রা! কি খবর?

হাসি হাসি মুখ করে ইস্টুপেন্ট্রা আমার দিকে তাকালো সে। জানালো আমার গল্পটা পড়ে
নাকি গ্রহে ওর যত্ন আত্মি বেশ বেড়ে গেছে। তাঁকে জাতীয় বীর পদকেরও নাকি সিদ্ধান্ত
নেয়া হয়েছে। কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে। পদক দেয়ার আগে তাকে এটা প্রমাণ করতে
হবে যে, সে সত্যি সত্যিই কোন গোবরে পোকাকার সাথে যুদ্ধ করেছে। আর সে জন্য এবার
সে এসেছে কয়েকটা গোবরে পোকাকে বন্দি করে নিয়ে যেতে। আমার দিকে বুরিটা এগিয়ে
দিলো সে। অনুরোধ করে বললো, দয়া করে যদি দু একটা গোবরে পোকা ধরে দেই তাঁকে।

আমি বললাম, সেতো তুই নিজেই ধরে নিতে পারিস!

আমার কথায় কেমন মিইয়ে গেলো সে। হাসি হাসি মুখটা কেমন গোমরা হয়ে গেলো।
তারপর জানালো, বীর পদক পাবে এই আশায় সে খুব আনন্দে আছে। এখন অযথা গোবরে
পোকাকার সাথে যুদ্ধে গিয়ে প্রাণটা খোয়াতে চায়না। তাই যদি আমিই কাজটা করি দেই তাহলে
খুব ভালো হয় ওর জন্য।

হাসি পেলো বেচারার অসহায় অবস্থা দেখে। কিছুটা অবশ্য বিরক্তও হলাম। আমি এখন গোবরে পোকা খুঁজি কোথায় গিয়ে?

কিন্তু ওর যা স্বভাব না করলেও শুনবে। আঠার মতো পিছে পড়ে থাকবে। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই এদিক সেদিক ঘুরে তিন চারটা গোবরে পোকা ধরে দিলাম ওকে। কি জানি ওষুধ দিয়ে গোবরে পোকাগুলোকে অজ্ঞান করে ইস্টুপেন্ট্রা বিদায় নিলো।

এই ঘটনার ছমাস পরে। একদিন বাইরে তুমুল শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো আমার। জানালায় দিকে মুখ বাড়াতাই দেখলাম ইস্টুপেন্ট্রা আবার হাজির। এবার একা নয়, সঙ্গে বেশ দলবল নিয়ে এসেছে।

আমি হাকলাম, কিরে ইস্টুপেন্ট্রা, আবার কি হয়েছে?

কথা শেষ হবার আগেই জানালা দিয়ে বেড়ালের মতো গা গলিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে ওরা। হৈ চৈ করে নিজেরদের মধ্যে কি যেন গাই গুই আলোচনা চালালো। তারপর ইস্টুপেন্ট্রা এগিয়ে এসে আমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলো।

কাগজে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা, “খুব বিপদ! “।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিপদটা কি?

ইস্টুপেন্ট্রা হা পা নেড়ে কোন রকমে আমাকে যা বুঝালো তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেই যে তিনটে গোবরে পোকা ধরে দিয়েছিলাম ওদের? সেই তিনটে নাকি এখন ওদের পুরো গ্রহ দখল করে নিয়েছে!

ফেরার পথের ফকির



এক

লোকটা একটু আগেও দিকি সুস্থ সবল মানুষ ছিলেন। ষাটোর্ধ বয়স। গায়ে বড়লোকি পোশাক আশাক। মেহেদি লাগানো লাল চুল দাঁড়ি। দামী গাড়িতে নিজেই ড্রাইভিং করে এলেন। গাড়িটা রাস্তার পাশে থামিয়ে পকেট থেকে বের করে একটু সিগারেট ধরালেন ঠোটে। সিগারেটের ধোয়ার সাথে একটা বোধহয় দীর্ঘশ্বাসও ছাড়লেন। আর তারপরেই হঠাৎ বুক চেপে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। কাছেই দোকানপাটে লোকজন গিজ গিজ করছিলো। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই লোকটাকে ঘিরে একটা জটলা তৈরি হয়ে গেলো। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন চেষ্টা করে বললো, আরে ভাই দেখেন কি হাসপাতালে নিয়া যান।

অনেকেই “হ হ, হাসপাতালে নিয়া যান” বলে তাঁর কথায় গলা মেলাল। কিন্তু হাসপাতালে নেয়ার মতো কাওকেই এগিয়ে আসতে দেখা গেলনা। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কাধাক্কি করে একটু লোক ঢুকে গেলো। লোকটার বোধহয় এক আধটু ডাক্তারি বিদ্যা জানা ছিলো। চিৎ হয়ে পড়ে থাকা লোকটার একটা হাত তুলে নাড়ি দেখতে লাগলেন তিনি। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো, আছে? নাকি গেছে?

নাড়ি দেখতে বসা লোকটা হাত ছেড়ে দিলেন। হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, না নেই। মারা গেছেন।

“আহারে!”

“ভদ্রঘরের লোক। রাস্তায় পড়ে মরলেন।”

ভিড়ের মধ্যে শোর উঠলো। কে যেন চঁচিয়ে বললো, চিনেন কেউ? এলাকার কে আছেন?

ভিড় ঠেলে একজন লোক এগিয়ে আসলেন, দেখি ভাই... আমারে একটু দেখতে দেন। একটু আলো ধরেন তো কেউ?

মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠলো কয়েকটা।

“চিনলেন?”

“না।”

“দেখেন তো পকেটে কিছু আছে নাকি?”

একটা দামী মোবাইল, মানিব্যাগ, গাড়ি চাবি বেরোল পকেট থেকে। মানিব্যাগের মধ্যে পরিপত্র মিলল। ঠিকানাও পাওয়া গেলো। ১৫ এর এ। এলাকার সবচেয়ে সুদৃশ্য বাড়ি। লোকটাকে না চিনতে পারলেও, বাড়িটা সকলেই চিনতে পারলো।

দুই

ভাঙ্গা একটু ঘর। দুটো চৌকি পাশাপাশি রাখা। একটা চৌকিতে চাদর মুড়ি দেয়া একটা লাশ রাখা। অন্যটাতে কিছু ছেলেমেয়ে বসে একটানা কোরআন পড়ছে সুর করে। মেঝেতে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে আছেন একজন মহিলা। তাঁকে ঘিরে আরো কিছু মহিলা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে। বাইরে ভিড় কোলাহল।

কে যেন বললো, ভালো মানুষটা বের হইলো। ফিরলো মরা।

“কি হইছিলো? এক্সিডেন্ট?”

“আরে না! হেরা দুই ভাই। বড় ভাই আর ছোট ভাই দুইয়েই রিশকা চালায়। সকালে গ্যারেজে যাইতছিলো। হঠাৎ করে ছোট ভাই রাস্তার মধ্যে বইস্যা পড়লো। বড় ভাই জিগাইলো, কিরে কি অইছে?”

ছোট ভাই কইলো, ভাইরে বুকতে কেমন লাগে! এক গেলাস পানি খাওয়াও। বড় ভাই গেলো পানি আনতে, আইস্যা দেখে ছোট ভাই মইর্যা পইড়া আছে।

বর্ণনা শুনে হা হতাশ করে লোকে। কেউ কেউ জিঙেস করে, জানাজা কহন? কাফন দাফনের কি ব্যবস্থা?

ঘরে দাওয়ায় মাথায় দিয়ে বসা ছিলো বড় ভাই। কাফন দাফনের কথা কানে যেতেই যেন আবার ভাইয়ের শোক উতলে উঠে তাঁর। চিৎকার করে কাঁদতে থাকে সে।

লোকে ভাবে, কাফনের টাকা হয়তো নেই। দাফনের ব্যবস্থা নিয়া হইতো পেরাশান। নাইলের গরীবের আবার এতো শোক কি?

যারা জটলা বেধে কথা বলছিলো তারা এগিয়ে যায়। একজন সাঙ্কনা দিয়ে বলে, চিন্তা কইরোনা মিয়া। কাফনের দাফনের জন্য ঠেইকা থাকবোনা।

অমুক বলে, আমার কাপড় দোকান আছে। কাফনের কাপড়টা নাহয় আমিই দেব।

তমুক বলে, আমার বাঁশের ঝাড় আছে। বাঁশ যে কয়খান লাগে আমার এখান থেকেই নিও।

বড় ভাইয়ের কান্না থামে। সে চোখ মুছে মন শক্ত করে বলে, কারো দেয়া লাগবোনা। আমার ভাইয়ের দাফন কাফন কারো দানে করুমনা আমি।

তিন

বিশাল বাড়িখানা আলোতে ঝলমল করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বোধহয় কোন বিয়ে বাড়ি বোধহয়। অবশ্য কোলাহল নেই। একদম শান্ত শিষ্ট। বাড়ির গেইটে দারোয়ানের পাশে বসে হঠাৎ বাতাসে কান পেতে কি যেন একটা শোনার চেষ্টা করলো বাড়ির কুকুরটা। তারপর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। দূর থেকে একটা শোরগোলের শব্দ শোনা যেতে লাগলো। কাঁধে করে একটা খাটিয়া নিয়ে হাজির হলো বেশ কিছু লোকজন।

“গেইট খোলেন। গেইটের মধ্যে মাথা ঠেকিয়ে বললেন একজন। দারোয়ান গেইটের কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন, লাশ বাইরেই রাখতে বলছে।”

“বাইরে রাখবো মানে? বাড়ির কেউ দেখবোনা?”

দারোয়ান গেইট ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে এলেন। একটা জায়গা দেখিয়ে সেখানে খাটিয়াটা রাখতে দেখিয়ে বললেন, স্যারের ছেলেমেয়েরা আদরে মানুষ। লাশ বাড়িতে ঢুকাইলে ভয়

পাবে।

লোকজন দারোয়ানের কথা শুনে মুখ চাওয়া চাওয়া করে। কেউ কেউ অবশ্য দারোয়ানের কথায় তাল দিয়ে বলে, হ! বাচ্চা কাচ্চাদের লাশ না দেখানোই ভালো। মনে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বয়স কতো তাদের?

“ছোটটার পঁচিশ! আর বড়টা..., দারোয়ান নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে।”

বাকি কথা আর কানে ঢুকেনা লোকের। পঁচিশ বছরের বাচ্চা? বাপের লাশ দেখলে ভয় পাবে? আর কিছু ভাবতে পারেনা তারা। শেষে একজন “বড়লোকদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা” বলে পুরো ব্যাপারটা মীমাংসা করে দেন। একজন লোক এগিয়ে গিয়ে দারোয়ান কে বললেন, ভাই, লাশটা উদোম পড়ে আছে। একটা চাঁদর টাঙ্গান কিছু আছেন কিনা দেখেন তো!

দারোয়ান মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। কে যেন ইতোমধ্যে নিজের টাকায় কিছু আগরবাতি এনে লাশের খাটিয়ায় গাঁথে দিয়েছে। আগর বাতির গন্ধে ম ম করছে পুরো জায়গাটা। একটু পরেই দারোয়ান ফিরে আসলো। জানালো, বাড়িতে লাশ ঢাকার জন্য সস্তা কোন কন্ডল নেই। এতো রাতে দোকান খোলা পাওয়া যাবে? টাকা দিয়েছে কিনে নেওয়ার জন্য।

লোকজন বললো, তাঁর আর দরকার নেই। ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

শীতের রাতে অনেকেই গাঁয়ে চাদর জড়িয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যেই একজন নিজের চাদরটা দিয়ে লাশের উপরটা ঢেকে দিয়েছেন ইতোমধ্যে। রাত গভীর হতে থাকলো। শীতের প্রকোপও বাড়তে শুরু করলো। উৎসাহী যারা এতক্ষণ লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ভিড় কমতে শুরু করে ধীরে ধীরে।

একসময় প্রায় খালি হয়ে যায় জায়গাটা। শেষ যে কয়জন ছিলেন যাওয়ার আগে দারোয়ান কে ডেকে বললেন, ভাই, আমাদের তো এবার যেতে হয়। কিন্তু লাশের পাশে তো কারো না কারো থাকা দরকার।

দারোয়ান বললো, বাড়ির সবাই তো ঘুমিয়ে গেছে। এক কাজ করেন, লাশটা একটু ধরাধরি কইর্যা আমার গেইটের কাছে রেখে যান। আমিই পাহারা দেই।

চোখটা যেন একটু লেগে এসেছিলো দারোয়ানের। চোখ খুলতে দেখে ভোর হয়ে এসেছে। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়ছে বাইরে। সেইসাথে একটু একটু দমকা হাওয়া শীতটাকে আরো ঝাঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। গেইট ফাঁক গলিয়ে বাইরে তাকাতে দেখলো দমকা হাওয়ায় লাশের

উপরে দেওয়া চাদরটা সরে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এলো সে। চাদরটা ঠিক করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন ওনি। লাশটা কি কাঁদছে নাকি? নাহ! পরক্ষনেই বুঝতে পারলেন ভুল দেখেছেন। আসলে কুয়াশার ফোঁটা লাশটার চোখ থেকে ঠিক অশ্রুর মতো গড়িয়ে পড়ছে।

খোকন রোকন দুই ভাই



এক

একদুপুর নদীতে ডুবিয়ে চোখ লাল করে পাড়ে উঠে রোকন। খোকন তখনও ডুবিয়েই চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে সহসাই উঠার কোন ইচ্ছা তার নেই। গা গতর বছর মুছে নদীর পাড়ে যেখানটাতে রোদ পড়েছে শীতে কাপতে কাপতে গিয়ে সেখানটাতে দাঁড়ায় রোকন। খোকনকে ডাকে, ভাই এইবার উইঠা আয়, দেড়ি করলে মায় মারবো।

খোকনের অবশ্য তাতে খুব একটা হুশ হলোনা। সে দ্বিগুণ উৎসাহে পানির মধ্যে হাপুশ করে ডুব দিতে দিতে বলে, মারুকগা; প্রতিদিন কি আহি?

খোকনের কথাই তো ঠিক। প্রতিদিন দিন আর নদীতে গোসলের ভাগ্য হয় ওদের? ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যে নদীটা গেছে সেটা এখন শুকিয়ে থাক। ভরা বর্ষা বাদলের দিনেও হাটু অবদি পানি জমেনা সেখানে। এক সময়ের ভয়াবহ শ্রোতের নদীকে দেখলে মানুষ আজকাল খাল ভাবতেও দ্বিধা করে।

আর তাই বছরান্তে যে দু একবার মায়ের সাথে নানু বাড়ি আসে ওরা, কেবল তখুনি নদী মিলে ওদের। আর সে সুযোগটা হেলায় ফেলায় এড়িয়ে যেতে পারেনা খোকন। যত বেশি

মজা একবারে নিয়ে যাওয়া যায় তত ভালো। সে ডুবিয়েই চলে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে এবার জন্য রোকনেরও এতো দ্রুত উঠে পড়ায় একটু একটু আফসোস লাগতে শুরু করে। আবার নামবে কীনা ভাবে সে। কিন্তু রোদের ওম পেয়ে শীতের ভয় বোকে ধরেছে ওকে। তাই আবার পানিতে নামার কথাটা পরক্ষণেই বাদ দেয় সে।

কিন্তু ওদিকে ওর ভাই ওর চেয়ে বেশি মজা করে ফেলছে এটাও যেন মনে নিতে পারেনা। তাই খোকনকে উঠানোর জন্য ভয় দেখিয়ে বলে, ভাই উঠ, দেখ মামা আইতাছে লাঠি নিয়া।

রোকনের কথায় ধরফর করে পাড়ে উঠে খোকন। তড়িঘড়ি করে কাপড় চোপর পড়ে নিয়ে রোকনের কাছে গিয়ে দাড়ায়।

জিঞ্জেস করে, কই? মামা না আইতাছে কইলি?

রোকন হাসে। খিলখিল করে হাসে। বলে, মিছা কইয়া উঠাইছি তরে।

মুহূর্তেই পুরো ব্যাপারটা ধরতে পারে খোকন। ছোট ভাইয়ের কথায় বোকা বনে গিয়ে একটু যেন লজ্জাও পায় সে। আর তারপরেই সে লজ্জা গিয়ে পরিণত হয় রাগে। মুখ শক্ত করে বলে, মিছা কস আমার লগে! বিকালে কইছিলা না মেলায় নিয়া যামু? এহন আর নিমুনা তোরে!

রোকন বলে, না নে! আমি মামার লগে যামু!

কথাটা শুনে যেন এক মুহূর্তের জন্য মিইয়ে পড়ে খোকন। আর তারপরেই কি যেন একটা কথা মনে আসতে আমার মুখ উজ্জল হয়ে উঠে ওর।

“ যা দেখি মামার লগে, মামা যে সহালে ডিউটিত গেলো মনে নাই?” কথাটা শুনেই মুখ শুকিয়ে যায় রোকনের। সত্যিই তো, আজতো মামা সকাল সকাল ই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেছে। কোথায় যেন কাজ আছে। সন্কার আগে বাড়ি ফেরার কোন আশা-ই নেই। কথাটা একেবারেই মনে ছিলনা ওর। মনে থাকলে কি আর এমন করে খোকনে রাগিয়ে দিতো ও। ভয়ানক আফসোস হয়। এবার যদি সত্যি সত্যিই খোকন কে মেলায় না নিয়ে যায়?

ভোল পালটে গেছে দুজনের। এতোখন হাসতে থাকা রোকনের মুখ এখন শুকনো। খোকনের মুখ হাসি হাসি। সে গামছাটা কাধে ঝুলিয়ে বাড়ির পথে হাটতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। তার পিছু পিছু পুলিশের কাছে সারেভার হওয়া অপরাধীর মতো মুখ করে রোকনও হাঁটে।

রোকন কান্নার স্বরে বলে, মা ভাইরে কওনা আমারে নিয়া যাইতে!

মা রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। তিনি সেখান থেকেই চেচিয়ে বলেন, এই খোকন, রোকনরে লগে নিয়া যা!

নতুন কাপড় পড়ে, চুলে চপচপে করে তেল দিয়ে আয়নার সামনে চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিলো খোকন। তার পেছনেই দরজায় রোয়াকে গাল ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোকন। চুলে চিরুনি বুলাতে বুলাতে একবার সেদিকে ফিরে তাকায় খোকন। মাথা ঘুরিয়ে বলে, মারে কইলে কি অইব? তোরে আমি লগে নিমুনা!

রোকন এবার দ্বিগুণ জুড়ে চেচায়, ও মা... নিবনা নাকি কয়...

মায়ের উত্তর আসার আগেই ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে খোকন। পিছু নেয় রোকনও। মায়ের কাছে বিচার দিয়ে যে আর কিছু হবেনা সেটা এতোখনে বুঝে গেছে সে। তাই ভাইয়ের পিছু পিছু গিয়ে অনুনয় করে এবার, “ও ভাই, নিয়া যা না আমারে!”

খোকন হাটতে হাটতে মুখ শক্ত করে বলে, “না!”

“আল্লা কসম আর মিছা কথা কমুনা। কোরান শরীফের কিরা”

খোকনের তাও মন গেলনা। সে হাটতেই থাকে। একদম মিয়া পাড়ার জঙ্গলা জায়গাটার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। রোকনও আসে তাঁর পিছু পিছু।

ভাইয়ের চোখে সহসা খুব মায়ার চোখে তাকায় খোকন। একটা দিকে হাত তুলে নরম স্বরে বলে, রোকন দেখ ঐইডা কি?

বাড়িয়ে বাড়ানো হাতের নির্দেশিত দিকে চোখে ফিরিয়ে তাকায় রোকন। একটা খালি পথ, কিছু গাছ আর ধূলোর মধ্যে গড়াগড়ি খেতে থাকা কিছু চড়ুই পাখি বাদে আর তেমন কিছুই চোখে পড়েনা ওর।

ফিরে ভাইকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, দেখে ভাই ততোক্ষণে লাপান্তা। খোকনযে ওকে ফাকি দিয়ে পালিয়েছে সেটা বুঝতে বাকি থাকেনা আর। সশব্দে চিৎকার করে উঠে। দৌড়ে ঢুকে যায় জঙ্গলের পথটা দিয়ে। চেচাতে থাকে, “অই ভাই নিয়া যা আমারে... অই ভাই...”

রোকনের গলার আওয়াজ কমে যেতে বুপের আড়াল থেকে বেড়িয়ে আসে খোকন। রোকনটাকে পিছু ছাড়তে পেরে ভারি একটা আনন্দ হয় ওর। এবার নিশ্চিন্তে মেলায় যাওয়া যাবে। ফুরফুরা মন নিয়ে হাটতে থাকে সে। জঙ্গলা পথটা পেরিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠে।

বড় রাস্তা পেরোলে পড়ে চুনা দিঘির পাড়, সে পাড় ধরে খানিকটা পেরোলেই চোখে পড়ে একটা বিশাল মাঠ। অন্য সময় এখানে ধান লাগানো। কিন্তু এখন ধান কেটে ফেলায় বিশালটা মাঠটা একদম খালি। সে মাঠেরই এক কোনে কাপড়ের প্যাভেল টানিয়ে মেলা বসেছে। খোকন যত কাছে এগোচ্ছে ততো ভিড় বাড়ছে। শয়ে শয়ে লোক, শয়ে দোকান আর শয়ে শয়ে আজব সব জিনিস। হই হটগোল যেন লেগেই আছে। মেলায় ঢুকার গেইট পেরোতেই শুরু হয়ে যায় পসরা সাজিয়ে বসা দোকানের লাইন। কোথাও জিলাপি ভাজছে তো কোথাও মিষ্টি সাজিয়ে বসেছে। কোথাও মাটির ঘোড়া, হরিণ, বাঘ আবার কোথাও মেয়েদের মনহরী পণ্য। হাটতে হাটতে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে খোকন। দোকানটাতে হরেক রকম প্লাস্টিকের জিনিসপত্রে ভরা। ওর নজর গিয়ে পড়ে একটা চাইনিজ বন্দুকের উপর। একটা খেলনা বন্দুকের অনেকদিনের শখ ওর। সেই পাড়ায় একবার বাবলুর হাতে দেখেছিলো। কি সুন্দর লাল নীল রঙ করা। ট্রিগারে টিপ দিলে আবার “ঠেই... ঠেই” করে গুলির আওয়াজ হয়। অনেকদিন ধরে পয়সা জমিয়েছে সে। এবার না কিনে ফিরবেনা ও।

তিন

সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। মা খালারা দাওয়ায় বসে চুলে বিলি কাটছিলেন। এমন সময় বাড়িতে “ঠেই ঠেই” করে বন্দুক চালিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়িতে এলো খোকন।

টুকেই বললো, “মা দেহ কি আনছি...রোকন কই?”

মা অবাক হয়ে বললেন, রোকন না তোর লগেই মেলায় গেলো?

মায়ের কথা দাঁড়িয়ে পড়ে খোকন। বন্দুকের “ঠেই ঠেই” বন্ধ হয়ে যায়। একবার আঁস্টে করে বলে, “অই এহনও বাড়ি আহে নাই?”

উত্তরের অপেক্ষা করেনা আর। এক দৌড়ে আবার বেড়িয়ে যায় বাড়ি থাকে। সোজা গিয়ে থামে মিয়া বাড়ির জঙ্গলের কাছে। হাপিয়ে উঠেছে সে। তাই দাঁড়িয়ে খানিকটা জিরিয়ে নেয় ও। জঙ্গলের মুখে চিৎকার করে ডাকে, “রোকন... অই রোকন...”

কোন উত্তর আসেনা। এতোখনে রাত নেমে এসেছে। ঘন অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে জায়গাটে। ভূত প্রেতের আড্ডাখানা এই জঙ্গলের কাছে অন্যদিন হলে এই রাতের বেলায় আসার চিন্তাও করতে পারতোনা খোকন। কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। দ্রুত পায়ে জঙ্গলের মধ্যে

টুকে পড়ে সে। ভয় করেনা। গা ও ছমছম করেনা। তাঁর মাথায় এখন একটাই চিন্তা।
ভাইকে খুঁজে বের করা।

কিছুদূর এগিয়ে আবার ডাকে সে, “রোকন... ঐ রোকন”।

জঙ্গলের প্রতিধ্বনি তুলে ওর ডাক। কিন্তু কোন উত্তর আসেনা। সহসা একটা শব্দ এসে
কানে বিঁধে ওর। যেখানে ও এখন দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর থেকে খানিকটা এগুলেই একটা
প্রকাণ্ড বট গাছে। সে বটগাছের নীচে বসে কে যেন জিরিয়ে জিরিয়ে কাদছে। পেত্নি নাকি?

হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে যায় খোকন। একবার ভাববে পালিয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই
আবার খানিকটা সাহস সঞ্চর করে। কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে যায় বটগাছটার দিকে।
কাছাকাছি যেতে এবার ছায়াটা ভালো করে চোখে পড়ে ওর। কে যেন হাটু মুড়ি দিয়ে বসে
আছে।

“রোকনা না?” রোকনইতো। কাছে যেতেই স্পষ্ট হয়ে উঠে খোকনের কাছে। মেলায়
যেতে না পেরে এই অন্ধকারেও অভিমান করে বসে আছে সে।

খোকন বলে, “অই রোকন বাড়ি চল”। রোকন গুঙ্গিয়েই চলে। কাঁদতে কাঁদতে বলে,
“না... যামুনা। তুই আমারে মেলায় নেস নাই।”

খোকন হাত ধরে টানাটানি করে। রোকন উঠেনা।

শেষে সদ্য কেনা বন্দুকটা এগিয়ে দেয় ছোট ভাইয়ের হাতে।

“দেখ মেলারতনে তোর লাইগা কি আনছি।”। ট্রিগার চাপতেই লাল নীল আলো জ্বলে
উঠে বন্দুকে। সেই নিশুপ বনে “ঠে ঠে ” করে আওয়াজেই ফাকে খিল খিল হেসে উঠে
রোকন। বলে, “হাছা হাছাই এইডা আমার? পরে আবার নিয়া নিবিনাতো?”

চার

খোকন বলে, এই সুন্দর লালফুলটা আমার।

রোকনে বলে, এই দেশের যত লালফুল আছে সব আমার।

“তাইলে এই বিশ্বভর্তি যত ফুল আছে সব আমার।”

“সৌদি, মালেশিয়া, এণ্ডিয়ার, আফ্রিকার সব ফুল আমার।”

“দেখ গাধায় কয় কি। বিশ্ব হইছে সব চাইতে বড়। সৌদি, মালেশিয়া, এণ্ডিয়ার,
আফ্রিকার চাইতেও বড়।”

“আইচ্ছা তাইলে, তুই যত কবি তার চাইতে এক বেশি ফুল আমার।”

“হ... কইছে। তোর থেইক্কা একশো বেশি, হাজার বেশি, লাখ লাখ কোটি কোটি বেশি ফুল আমার।”

ভাইয়ের কথায় এবার যেন খানিকটা চিন্তায় পড়ে যায় রোকন। কোটির চেয়ে আর বড় কোন সংখ্যা আছে কীনা তার জানা নেই। কিন্তু ভাইয়ের কাছে হারতেও যেন সে রাজি নয়। তাই অনেক ভেবে চিনতে বলে, তুই যত কবি তার থেকে কোরান বেশি, হাদিস বেশি, আল্লা বেশি আমার।

খানিকটা থমকে যায় খোকন। কোরআন, হাদিস, আল্লাহর চেয়ে আর বেশি কিছু ভাবতে পারেনা সে। কিছু বললেও আবার পাপ হতে পারে। খানিকটা যেন মিইয়ে যায় সে। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ধুম করে বার কয়েকটা কিল বসিয়ে দেয় রোকনের পিঠে। ছোট ভাইয়ের কাছে আবারও হেরে গিয়ে রাখে যেন ফেটে পড়ে সে। বলে, “যেনে হেনে আল্লার নাম লস। গোনা হইবনা তোর?”

রোকন আকস্মিকতায় কিছু বুঝে উঠতে পারেনা। কিল খেয়ে একবার দ্রুত চোখে খোকনের দিকে তাকায়। কিন্তু পরক্ষণের চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে ওর। কাঁদতে কাঁদতে বলে, “আমারে মারছস! মার কছে বিচার দিমু”

খোকন আমার তেড়ে আসে। রোকনের ঘাড় ধরে ধাক্কা সজোরে ধাক্কা মারে সে। “যা, দে গিয়া বিচার।”। টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে রোকন। তারপর উঠে সজোরে চিৎকার করতে করতে বাড়ির দিকে ছুটে সে।

রোকন চলে যেতে রাস্তার পাড়টাতে বসে পড়ে খোকন। পথটা লাল বনফুলে ছেয়ে আছে। ওদের ধাপাধাপিতে অবশ্য কয়েকটা ফুল থেতলে গেছে। সেদিকে একবার তাকায় খোকন। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে ভাবে, “বজ্জাতটারে গতকাল বন্দুকটা দেয়াই ভুল হইছে। মহাভুল!”

এক কাপ চা এবং তিরিশখানা ভোট



ধীরে ধীরে মানুষজন বাড়ছিল। কিছুখন পরেই সেটা একটা একটা বিশাল জনস্রোতে পরিণত হলো। কিছুখনের মধ্যেই প্রধান সড়কটা বন্ধ করে দিয়ে মিছিল করতে বেড়িয়ে পড়লো ওরা। রাস্তায় যত রিকশা ছিল, গাড়ি ছিল, মানুষ ছিল সবার হঠাৎ থেমে যেতে হলো। মানুষের পক্ষ থেকে সে মিছিলে কেবল শরীক হলো পাগল নুরু মিয়া। সে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বললো, “ভোট! ভোট! ভোট! জনগণের ভোট!”। অন্যরা ভ্রু কুণ্ঠিত করে দাঁড়িয়ে রইলো মিছিল চলে যাওয়ার আশায়। এক রিকশাওয়ালা গিয়েছিল মিছিলের ফাক গলিয়ে বেড়িয়ে যেতে কিন্তু একটু পরেই সে নিজের নাক দুফাক করে বেড়িয়ে এলো। নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকলো দরদর করে।

ঘন্টা দুয়েক বাদ্য বাজনা নিয়ে রাস্তা আটকে মিটিং মিছিল চালালো রাজনৈতিক লোকগুলো। তাঁরপরে বোধহয় দয়া হলো, বিদায় নিলো তারা সেদিনের মতো।

মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান বসেছে। দোকানের দেয়ালে সাটিয়ে রাখা পোস্টারের প্রার্থীর নামে এক আধটু গুনকীর্তন করলেই চা মিলছে বিনামূল্যে। ছেলে বুড়োদের উপচে পড়া ভিড় সেখানে। আসছে, খাচ্ছে আর ভোটের অঙ্গিকার করে বিদায় নিচ্ছে একেকজন। পাগল নুরু মিয়া বেশ কয়েকবার দোকানটার আশেপাশে ঘেসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যুৎ

করতে পারেনি। কাছে গেলেই লোকজন খেকিয়ে উঠছে। একজন অতি উৎসাহী আবার লাঠি দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে তাঁর পায়ে। এখনও ব্যাথায় টনটন করছে জায়গাটা। এরপরও বিনামূল্যের চায়ের আশা ছাড়তে পারেনি নুরু মিয়া। এদিক সেদিক ঘুরে একটা গাছের গা থেকে একটা পোস্টার টেনে তুললো সে। পোস্টারে প্রার্থীর হাসিমাখা মুখ। নুরু মিয়া পোস্টারটা নিয়ে ধীরপায়ে আবার দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে বললো, এরেই ভোট দিমু! চা দেও দেখি!

অমনি সবাই হৈ চৈ করে উঠলো, “হুর! হুর! ভাগ ব্যাটা। পাগলের আবার ভোট হয় নাকি?”

স্কুলের মাঠে সেদিন বেশ ভিড় জমেছে। শত শত মানুষ আসছে ভোট দিতে। এমন সময় একজন সর্বজ্ঞ এবং মহানুভব লোক এসে ঘোষণা করলেন, “ভাই সকল! আপনারা সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্ট করেছেন। তাই আপনাদের এই কষ্ট লাঘবের জন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। আপনারা কোন প্রার্থীকে ভোট দিবেন সেটা তো আমরা জানি-ই। সুতরাং আপনারা সবাই চাইলে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। আমরা কথা দিচ্ছি আপনাদের ভোটটা আমরা অবশ্যই দিয়ে দেব।”

ঘোষণার পর এমনিতেই অর্ধেকের বেশি লোক চলে গেল। যে গুটি কয়জন “অধিকার! অধিকার” বলে এক আধটু শোরগোল করছিল তাদের ঝেটিয়ে বিদায় করে দেয়া হলো। ভোট চলতে থাকলো। নিরাপদে, নিরুপদ্রপে, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে। ভোট দিতে দিতে হাপিয়ে উঠতে লাগলো একেকজন নেতা কর্মী। দেড়-দুহাজার মানুষের ভোট চার পাঁচজন মিলে দেয়া, সেকি আর চারটে খানি কথা?

এদিকে বেলা বাড়ছে। দাওয়ায় বসে গভীর মনযোগে নিজের লাঠিখানা যাচাই করতে করতে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছেন ভোটকেন্দ্রের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যটি। এইফাকে কোথা থেকে এসে যেন সেখানে একটা কুকুর এসে জোটেছে। কারো কোন কথা ছাড়ই সে নিজে থেকেই ঘুমন্ত পুলিশের অবর্তমানে পাহারার দায়িত্ব নিয়ে বসে পড়লো সেখানে। এমন সময় ভোট কেন্দ্রে এসে হাজির হলো পাগল নুরু মিয়া। কুকুরটা তাঁকে একবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে একবার “ফোক!” করে তাঁকে ভেতরে ঢুকার অনুমতি দিল।

নুরু মিয়া ঢুকতেই ভেতরে একটা শোরগোলের মত পড়ে গেল।

“আরে পাগলটা ঢুকলো ক্যামনে?”

“থাক! থাক! শোর কইরোনা, জিগাও তো কি চায়?”

“নুরু মিয়া কি চাও? ভোট দিবা?”

সেদিন সন্ধ্যায় আবার মিছিল বের হলো। রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে গেল আবার। রিকশা, মটর থেমে গেলো। সাধারণ পথিকদের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। এবার আর পাগল নুরু মিয়াও সেই মিছিলে কেন জানি সামিল হলোনা। মোড়ের বিনামূল্যের চায়ের দোকানটা এখন খালি পড়ে আছে। সে চলে গেল ওদিকে। পুরো দোকানে ছেয়ে থাকা অজস্র পোস্টারের একটার সামনে গিয়ে দাড়ালো সে। পোস্টারে প্রার্থীর হাসোজ্জল মুখ। কিছুখন গালে হাত দিয়ে ছবিটার দিকে ঠায় তাকিয়ে রইলো। সহসা নুরু মিয়া একদলা থুথু ছিটিয়ে দিল পোস্টারটাতে। তারপর বিড়বিড় করে বললো, “শুয়োরের বাচ্চাটারে তিরিশখানা ভোট দিলাম আর শালারা পাগলের কোন ভোট নাই কইয়্যা এক কাপ চা দিলোনা আমারে।”

লেখক পরিচিতি

জাবেদ ভূঁইয়া: লেখক, প্রযুক্তিবিদ এবং চিন্তক। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ভ্রমণ এবং সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সমসাময়িক জীবনের অসঙ্গতিকে সহজ ভাষায় রসাত্মক ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি জীবনের গভীর অনুভূতি ও স্মৃতিকাতরতাকে দরদি শব্দে রূপ দিতে তিনি পারদর্শী। তিনি জনপ্রিয় অনলাইন সাময়িকী ‘খিচুড়ি’ (khichuri.net)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক।